

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি:

একটি পর্যালোচনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা

রোলঃ ২৩১০০১২০৮০৫

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি:

একটি পর্যালোচনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা

রোলঃ ২৩১০০১২০৮০৫

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি: একটি পর্যালোচনা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খাদিজা, আইডিঃ ২৩১০০১২০৮০৫ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি: একটি পর্যালোচনা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Khadija

(স্বাক্ষর)

খাদিজা

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আইডিঃ ২৩১০০১২০৮০৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	৬
অধ্যায়-১ কুরআন ও নৈতিকতা	৮
১.১ কুরআনিক শিক্ষার মূলনীতি	১০
১.২ নৈতিকতার সংজ্ঞায় কুরআন	২৩
১.৩ আদর্শ সমাজ গঠনে কুরআনের ভূমিকা	২৬
অধ্যায়-২ নৈতিক অবক্ষয়.....	৩১
২.১ তাকওয়া হীনতা ও আখিরাত বিমুখতা	৩১
২.২ সততা ও আমানতদারিতার অভাব	৩৩
২.৩ হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার.....	৩৫
২.৪ অপচয় ও ভোগবাদ	৩৭
২.৫ আত্মিক অস্থিরতা ও হতাশা	৩৮
২.৬ অশ্লীলতা ও চারিত্রিক পতন	৪০
২.৭ হত্যা ও পাপাচার	৪১
অধ্যায়-৩ সামাজিক সংহতি ও পারিবারিক ভাঙন.....	৪৩
৩.১ পারিবারিক কাঠামো ধ্বস	৪৩
৩.২ প্রতিবেশীর হক ও সামাজিক দূরত্ব.....	৪৫
৩.৩ বিবাহবিচ্ছেদ ও সামাজিক অস্থিরতা	৪৭
৩.৪ বিচারহীনতা ও দুর্নীতির প্রসার.....	৪৯
অধ্যায়-৪ আধুনিক বিশ্বের সংকট ও কুরআন	৫২
৪.১ অর্থনৈতিক বৈষম্য: সুদি ব্যবস্থার প্রসার ও যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির অনুপস্থিতি	৫৩
৪.২ লিঙ্গ বৈষম্য ও নারী অধিকার: কুরআনিক অধিকার বনাম আধুনিক শোষণ.....	৫৫
৪.৩ অপরাধপ্রবণতা ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা	৬০
অধ্যায়-৫ মুসলিম বিশ্বের বর্তমান চিত্র	৬২

অধ্যায়-৬ কুরআনমুখী হওয়ার উপায় ও সমাধান.....	৭৩
৬.১ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন.....	৭৪
৬.২ পারিবারিকভাবে কুরআনের চর্চা বাড়ানো.....	৭৮
৬.৩ মিডিয়া ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার.....	৮২
৬.৪ কুরআনের ব্যপারে ভুল উপলব্ধি থেকে বেচে থাকা.....	৮৪
৬.৫ শর্তহীন আনুগত্য.....	৮৬
অধ্যায়-৭ উপসংহার ও সুপারিশ.....	৮৯
৭.১ সারসংক্ষেপ.....	৯০

ভূমিকা

মানবসভ্যতার ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল ও অর্থবহ করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে ঐশী গ্রন্থ পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআন হচ্ছে সেই ধারার সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটি কেবল একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং মানবজাতির জন্য এক অনন্য 'ম্যানুয়েল' বা জীবন পরিচালনার গাইডলাইন। ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা থেকে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা—সবকিছুর মূলনীতি এতে বর্ণিত হয়েছে।

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা এবং জাগতিক সমৃদ্ধি ঘটলেও মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক বিশাল শূন্যতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আধুনিক বিশ্বের মানুষ যখন কুরআনিক শিক্ষা ও মহান আল্লাহর নির্দেশনা থেকে বিমুখ হয়ে কেবল ভোগবাদিতা ও বস্তুবাদী আদর্শের পেছনে ছুটছে, তখনই সমাজে অস্থিরতা, পারিবারিক কলহ এবং চরম নৈতিক অবক্ষয় মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে মানুষের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে যে ব্যবধান তৈরি হয়েছে, তা সমাজকে এক অন্ধকার গহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আলোচ্য থিসিসের মূল উদ্দেশ্য হলো, কুরআন বিমুখতার কারণে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সৃষ্ট বহুমুখী ক্ষতিসমূহ চিহ্নিত করা। আল্লাহর স্মরণ (জিকির) ও বিধান ত্যাগ করলে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা কেন সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এর ফলে কীভাবে একটি সুস্থ ও সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, তা কুরআনের আয়াতের আলোকে পর্যালোচনা করা এ গবেষণার প্রধান উপজীব্য।

একটি সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য নৈতিক বিবর্তন প্রয়োজন। আর এই নৈতিকতার মূল উৎস হচ্ছে স্রষ্টার সান্নিধ্য ও তাঁর নির্দেশিত পথ। এই গবেষণাপত্রটি বর্তমান সমাজের অবক্ষয়িত চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি কুরআনিক হেদায়েতে ফিরে আসার মাধ্যমে কীভাবে একটি আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব, সেই দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

এই গবেষণাটি মূলত বর্ণনামূলক ও গুণগত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্যের মূল উৎস হিসেবে আল-কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ এবং নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমান সময়ের একজন জনপ্রিয় বাংলাদেশি

ইসলামি ধারার লেখক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ এর অনবদ্য সৃষ্টি ‘মাই লাইফজার্নি উইথ কুরআন’ বই থেকে কিছু অংশ নেওয়া হয়েছে।

আরব বিশ্বের জনপ্রিয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব দায়ী- ইলাল্লাহ ড. ইয়াদ কুনাইবী হাফিজাহুল্লাহ। তার সারা জাগানো অনলাইন সিরিজগুলোর একটি ‘বিল কুরআনি নাইইয়া’ এর অনুবাদ ‘কুরআন: জীবনের গাইডলাইন’ নামে বইটি চমৎকার বাংলা অনুবাদ করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল জলিল। এই বইটিতে কুরআনকে একটি জীবন্ত জীবন-বিধান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা আত্মিক পরিশুদ্ধি, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি এবং দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান পেতে সাহায্য করে। তার এই জনপ্রিয় বই থেকেও কিছু অংশ নেওয়ার চেষ্টা করেছি। এছাড়া বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রবন্ধ ও সমসাময়িক ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পরিশেষে সকল সীমাবদ্ধতা ভুলত্রুটি আমার পক্ষ থেকে এবং পূর্ণতা ও সফলতা আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে।

‘মনযিলে কুরআন’ রব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। হে আল্লাহ কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের বসন্ত ও অন্তরের নূর বানিয়ে দিন, এর দ্বারা আমাদের হতাশা ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিন।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অধ্যায়-১ কুরআন ও নৈতিকতা

পবিত্র কুরআন হলো ইসলামের নৈতিকতা ও জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি, যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, দয়া, সততা এবং আত্মশুদ্ধির নির্দেশ দেয়। এটি মানুষকে অহংকার, মিথ্যা ও অন্যায় থেকে দূরে রেখে একটি শান্তিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করে, যার মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ইসলামে নৈতিকতা, বিশেষত অপ্রায়োগিক নির্দেশনা বা সৎকর্মের জন্য নির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রধানত কুরআন ও হাদিস—ইসলামের কেন্দ্রীয় ধর্মগ্রন্থ—এর ওপর ভিত্তি করে গঠিত। অধিকন্তু, এগুলোর অধিকাংশই সর্বজনস্বীকৃত নৈতিক গুণাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে (মানুষ ও প্রাণীর প্রতি) দয়া, দানশীলতা, ক্ষমাশীলতা, সততা, ধৈর্য, ন্যায়বিচার, পিতামাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান, প্রতিশ্রুতি পালন, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তাদের প্রতি ভালোবাসা, তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ ও মুমিনদের প্রতি ভালোবাসা।

ইসলামী নীতিশাস্ত্রে ও নৈতিকতার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো রাযা-ই ইলাহি (আল্লাহর সন্তুষ্টি) অর্জন করা, অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে মানুষের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই প্রসঙ্গে নৈতিক আচরণের গুরুত্ব পাঁচটি কুরআনিক আয়াতে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে মুসলমানদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া হাদিসে মুহাম্মদ (সা.) কে উদ্ধৃত করা হয়েছে, “আমি নৈতিকতাকে পূর্ণতা দান করার জন্য নবী হয়ে আগমন করেছি।” আল-আদাব আল-মুফরাদ, (হাদিস - ২৭৩)

কুরআন কারিম একটি জালাতি গোসলখানা। সাধারণ দুনিয়াবী গোসলখানায় কয়েকবার ভালো করে গোসল করলে শরীরে আর কোন ময়লা থাকে না। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি গোসল করলে অথবা শরীরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ঢাললে সর্দি ধরে যায়, জ্বর এসে যায়। কুরআনি গোসলের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। যত গোসল করবে ততই আত্মিক পরিশুদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সাধারণ গোসলে শরীর ধৌত করা হয়, কুরআনি গোসলে কলব ধোয়া হয়। কুরআন তেলাওয়াত- তাদাব্বুর - আমলের গোসল দিয়ে যত বেশি কলব ধৌত করবে, আত্মিকভাবে শুদ্ধতর হতে থাকবে।

কুরআন কারীমের একেকটি আয়াত কলবের জন্য সাবানের মত। দুনিয়ার সাবান নয়, জান্নাতের সাবান। উপাদান -কেমিক্যাল সবই জান্নাতি। দুনিয়ার সাবান পরিষ্কার করে পরিধেয় কাপড় আর মানুষের শরীর, কুরআনি আয়াতের জান্নাতি সাবান পরিষ্কার করে কলব, মস্তিষ্ক।

কুরআন কারিম আত্মশুদ্ধির জন্য শুরুতেই একটি প্যাকেজ দিয়েছে : তাকওয়া প্যাকেজ। বলে দিয়েছে এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য। কুরআন একটি লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে, একটি গোল দিয়েছে, একটি ভিশন দিয়েছে, একটি মাইলফলক দিয়েছে, একটি চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। আমাদের জীবনসাধনা করে এই মাইল ফলক ছুঁতে হবে। মাইলফলকটি হল তাকওয়া। কুরআনে গোসল দিয়ে আমাদের ‘মুত্তাকিন’ এর কাতারে शामिल হতে হবে।

ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায়বোধ, শুভবোধ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইনসাফবোধ মানুষের মৌলিক ও জন্মগত প্রবণতা। অন্যের সাথে ঝগড়া-বিতর্ক যেন আমাদের ইনসাফ বোধ ছিনিয়ে নিতে না পারে। শত্রুতার আক্রোশ যেন আমাদের অন্ধ করে না দেয়। শত্রুর মধ্যে ভালো কিছু থাকলে, সুন্দর কোন গুণ থাকলে, প্রশংসনীয় কোন যোগ্যতা থাকলে, নির্দিধায় স্বীকার করে নিতে হবে। ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি যেন আমাদের সত্যচ্যুৎ না করে। রাগক্রোধ যেন আমাদের বিবেচনাহীন করে না দেয়। এজন্যেই আমাদের আল্লাহর রঙে রঙিন হতে বলা হয়েছে। এখানে আল্লাহর রং হলো কোন অবস্থাতেই ইনসাফ না হারানো।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

‘তারা সমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে একদল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তারা সিজদা করে।’

সূরা আল ইমরান - (৩ : ১১৩)

আহলে কিতাবদের একটি দলের প্রশংসা করা হয়েছে। সংঘাত-সংঘর্ষ যতই তীব্র আর প্রচণ্ড হোক না কেন, কথা ও কাজে ইনসাফ হারানো যাবে না। শত্রুতার জন্য বেইনসাফি বৈধ হয়ে যায় না। যত চরম শত্রুতাই থাকুক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য অনৈতিক ও অসাধু পন্থা অবলম্বন করা যাবে না। শত্রুর যোগ্যতা ও গুণ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হওয়া যাবে না। এটি কুরআনি সুন্নাহ। এটা আল্লাহর সুন্নাহ অনুসৃত রীতি।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ

‘তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। তাদের অধিকাংশই ফাসিক।’ (সূরা আল ইমরান - (৩: ১১০))

পুরো বিশ্বের জন্য এই উম্মতকে প্রেরণ করা হয়েছে। আমরা এই উম্মতের অংশ। কোন একটি প্রান্ত আমাদের কর্মপরিধির বাহিরে নয়। আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের সদস্য। আমাদের হীনবল হওয়ার কোন কারণ নেই। অন্য জাতির চাকচিক্য দেখে হতাশায় ভোগারও যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। আমরা পুরো বিশ্বের কল্যাণের কথা ভাবব। তাদের হেদায়েতের ফিকির করব। দাওয়াতের চেষ্টা- মুজাহাদা করব, ইনশাআল্লাহ।

১.১ কুরআনিক শিক্ষার মূলনীতি

কুরআনিক শিক্ষার মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে তিনটি প্রধান স্তরের ওপর: তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রিসালাত (নবুওয়াত ও কিতাব) এবং আখিরাত (পরকাল)। এই তিনটি মূলনীতি কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং একজন মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন।

তাওহীদ : তাওহীদ হলো ইসলামের প্রাণ। এর অর্থ আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় এবং সকল ক্ষমতার উৎস। অর্থাৎ আসমান ও জমিনসহ এর ভেতর ও বাহিরের জানা অজানা সকল সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করা। মুসলিমদের জন্য তাওহীদ বা একত্ববাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাওহীদের পরিশুদ্ধি ছাড়া কেউ মুসলিম হতে পারেনা। প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন অকার্যকর তেমনি বিশুদ্ধ তাওহীদ ছাড়া আমলও অকার্যকর। তাই ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য তাওহীদের আকিদা পোষণ করা আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাওহীদে বিশ্বাসী মানুষ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করে না। এটি মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে স্রষ্টার সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
'বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।' (সূরা ইখলাস - (১১২ : ১-৪))

ইখলাস (إخلاص) মানে একনিষ্ঠতা। এ সূরায় ইসলামের মৌলিক আকিদা তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য তাওহীদ তিন প্রকার :

- তাওহীদে রুবুবিয়াত তথা সকল জিনিসের স্রষ্টা, সকল ক্ষমতার মালিক ও রিজিকদাতা আল্লাহ। কাফেররাও এর প্রায় সবকটি স্বীকার করে থাকে।
- তাওহীদুল উলুহিয়াহ তথা বান্দা যেসব ইবাদত করে—দোয়া, মানত, কুরবানী যাই হোক না কেন সব আল্লাহর জন্য। মুশফিকরা গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করত। যদিও এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর নৈকট অর্জন করা। কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ছিল শিরক।
- তাওহীদুয যাত ওয়াল আসমা ওয়াস সিফাত। এ প্রকার তাওহীদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই মানুষ হোঁচট খেয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার জন্য যে জ্ঞান, কুদরত, ক্ষমতা, দৃষ্টি ও শ্রাবণশক্তি মানুষ (ভুল করে) তা অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে থাকে। চিন্তা করলে দেখা যাবে সূরা ইখলাসের এই তৃতীয় প্রকার তাওহীদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

নবীজি ﷺ কে এক আনসারী সাহেবের প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি বেশি বেশি সূরা ইখলাস কেন পড়েন?

—এই সূরায় রহমানের সিফাত বৈশিষ্ট্য আছে এজন্য এই সূরা পড়তেই আমার ভালো লাগে,

حُبُّكَ يَا هَا أَنْجَلَ الْجَنَّةِ

'এ সূরাটির প্রতি মোহাব্বত তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে।' বুখারী : (১/১৫৫)
রহমানের সিফাতের প্রতি মহব্বত, রহমানের নামের আলোচনা, রহমানের নামগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা, বৈশিষ্ট্য মনে হাজির রাখা, নামগুলোর অর্থ নিয়ে গবেষণা করা—জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম।

আবু হুরায়রা রাঃ বলেছেন, নবীজির সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। একজনকে (قُلْ هُوَ) (اللهُ أَحَدٌ) পড়তে শুনে নবীজি ﷺ বললেন : তার জন্য আবশ্যিক হয়ে গেছে।

-ইয়া রাসূলুল্লাহ, কি আবশ্যিক হয়েছে?

-জান্নাত।

সূরা ইখলাস পাঠ করলে এতবড় লাভ। আমি এই মহা সুসংবাদ লোকটিকে জানানোর জন্য যেতে উদ্যত হতেই চিন্তা হলো, সেদিকে গেলে দুপুরের খাবার বাদ পড়ে যাবে। খাবার খেতে চলে গেলাম। পরে এসে লোককে আর পায়নি (মুয়াত্তা মালিক)।

সূরা ইখলাছের এত গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য হওয়ার কারণ এই সূরায় দুনিয়া- আখিরাতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় ‘তাওহীদের’ বর্ণনা আছে। এই সূরায় শুধুই তাওহীদের কথা আছে অন্য কোন বিধান ও ঘটনা এই সূরায় নেই। তাওহীদ বান্দার জন্য নিয়ামত টেনে আনে। তাওহীদ বান্দাকে স্থায়ী আজাব থেকে সুরক্ষা দেয়।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۚ

‘আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু’টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।’ সূরা বাকারাহ- (২ : ২৫৫)

তাওহীদ এবং আল্লাহর গুণাবলির বর্ণনায় এটি পুরো কুরআনের সবচেয়ে মহিমাম্বিত আয়াত। এটাকে বলা হয় আয়াতুল কুরসি। এখানে আল্লাহর চিরঞ্জীব হওয়া, তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর অসীম ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদিসেও তাওহীদের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।’ (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবীগনকে সর্বপ্রথম মানুষকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানানোর শিক্ষা দেন। যেমন মুয়ায রাঃ কে ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন,

‘সেখানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতিদিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। তারা যদি এই কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর সাদকা (যাকাত) ফরজ করেছেন। তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পতিশালীদের নিকট থেকে (যাকাত) উসুল করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হবে।’ (সহি বুখারী, হাদিস-১৩১০)

কুরআন ও হাদিসসমূহ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, কেবল মুখে স্বীকার করা নয়, বরং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং কাজের মাধ্যমে শিরক থেকে মুক্ত থাকাই হলো প্রকৃত তাওহীদ। এটিই পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথ।

রিসালাত: রিসালাত ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস যা তাওহীদের পরেই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামি পরিভাষায়, মহান আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী ও বিধানসমূহ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্বকে রিসালাত বলা হয়। ‘রিসালাত’ শব্দের অর্থ হলো বার্তা, চিঠি পৌঁছানো, সংবাদ বা কোনো ভালো কাজের দায়িত্ব বহন করা। আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই বিশেষ দায়িত্ব যিনি পালন করেন, তাঁকে বলা হয় রাসূল বা নবী। প্রথম মানুষ সৃষ্টির সময় থেকে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা মানুষকে তার জীবনযাপনের জন্য পথনির্দেশনা ছাড়া রাখেননি। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তাঁর নবীদের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে তাঁর পথনির্দেশনা প্রকাশ করেছেন। যে নবীগণ আল্লাহর কাছ থেকে কিতাব লাভ করেছেন, তাঁদেরকে রাসূল বলা হয়। সকল নবী ও রাসূল একই বার্তা নিয়ে এসেছিলেন; তাঁরা তাঁদের সময়ের মানুষদেরকে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা-এর আনুগত্য ও ইবাদত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, অন্য কারো নয়। যখনই কোনো নবীর শিক্ষাকে মানুষ বিকৃত করেছে, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তাদেরকে সরল পথে (সিরাতুল মুস্তাকিম) ফিরিয়ে আনার জন্য আরেকজন নবী পাঠিয়েছেন।

রিসালাহ-এর ধারা আদম (আঃ) থেকে শুরু হয়ে নূহ (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ), ইসমাইল (আঃ), ইসহাক (আঃ), লুত (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), মুসা (আঃ), দাউদ (আঃ)-কে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে শেষ হয়েছে। নবী মুহাম্মদ ﷺ মানবজাতির কাছে আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থগুলো হলো তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এবং কুরআন। কুরআন, যা নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, হলো হেদায়েতের সর্বশেষ গ্রন্থ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَضَيُّ بِئِنَّهُمْ بِالْفَسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

‘প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক একজন রসূল ছিল। সুতরাং যখন তাদের রসূল এসেছে, তখন ন্যায়ভাবে তাদের ফায়সালা করা হয়েছে। আর তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হয়নি।’ সূরা ইউনুস -(১০:৪৭)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে —

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

‘নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, তাতে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। আর যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।’ সূরা আল-হাদিদ-(৫৭:২৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি আমার রাসূলদেরকে মু'জিয়া দিয়ে, স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করে এবং পূর্ণ দলীলসমূহ দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছি। সাথে সাথে তাদেরকে কিতাবও প্রদান করেছি যা খাটি, পরিষ্কার ও সত্য। আর দিয়েছি আদল ও হক, যা দ্বারা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের কথাকে কবুল করে নিতে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য হয়। হ্যাঁ, তবে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এবং বুঝেও বুঝতে চায় না তারা এর থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের কমপক্ষে চার জায়গায় নবী করিম ﷺ এর দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছেন। তার মধ্যে এটা বলা হয়েছে যে, নবী কারীম ﷺ কে আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়াতে কেন পাঠিয়েছেন? নবীজি ﷺ এর উপর কি কাজ অর্পণ করা হয়েছে?

নবীজি ﷺ এর কোন কাজ পরিচালনা করা দরকার ছিল? কুরআনুল কারীমে চার জায়গায় এই কাজ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন। সূরা বাকারার ১২৯ নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ كُنْتُمْ لِنَعْلَمِ ۚ
আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মধ্যে সর্বপ্রথম এই কাজের বর্ণনা দিয়েছেন যে, يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ - অর্থাৎ আমি আপনাকে এজন্য পাঠিয়েছি যে, যাতে আপনি মানুষের সামনে আল্লাহ তায়ালা আয়াত তেলাওয়াত করেন।

দ্বিতীয় কাজ এটা বর্ণনা করেছেন যে, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ - অর্থাৎ আমি আপনাকে এজন্য পাঠিয়েছি যে, যাতে আপনি আল্লাহ তায়ালা আয়াতগুলো মানুষকে শিক্ষা দেন। কেননা আমার কিতাব মানুষ সরাসরি বুঝতে পারবে না।

তৃতীয় কাজ এটা বর্ণনা করেছেন যে, وَالْحِكْمَةَ - এবং যাতে করে আপনি মানুষকে হিকমত শিক্ষা দেন, বুদ্ধিদীপ্ত ও জ্ঞান সমৃদ্ধ কথা শিক্ষা দেন।

চতুর্থ কাজ এটা বর্ণনা করেছেন যে, وَإِذْ كُنْتُمْ لِنَعْلَمِ ۚ - আমি আপনাকে এজন্য পাঠিয়েছি যে যাতে আপনি মানুষকে তাজকিয়া করেন এবং তাদেরকে পাক-সাফ ও পবিত্র বানান। এই আয়াতের মধ্যে তাজকিয়াকে বর্ণনা করার পূর্বে, কুরআনুল কারিমের আয়াতের তেলাওয়াত করার আলোচনা এসেছে, এরপর কুরআনুল কারিমের তালিম ও শিক্ষা দেওয়ার আলোচনা এসেছে, এরপর শেখানোর আলোচনা এসেছে। কিন্তু কুরআনুল কারীম বলে যে, শুধুমাত্র এই তিনটি কাজ যথেষ্ট নয়। বরং নবীজি ﷺ এর চতুর্থ কাজ হল মানুষের আমল, আখলাকে পবিত্র বানানো।

কারণ দুনিয়ার কোন জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করার জন্য শুধুমাত্র থিউরিক্যালি শিক্ষা যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ এর আমলি তারবিয়াত এবং আমলি ট্রেনিং না দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা নবীজি ﷺ কে উভয় কাজের জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যে, আপনি কুরআনুল কারিম প্রাক্টিক্যালি তালিম দিন এবং এটাও বলে দিন যে এই আয়াতগুলোর কি উদ্দেশ্য? সঙ্গে সঙ্গে আপনি মানুষকে তারবিয়াত দিন এবং তাদের তাজকিয়াও করুন, তাদেরকে আমল আখলাকের খারাপি থেকে পাক করুন এবং তাদেরকে পবিত্র বানান। এই জিনিস শুধুমাত্র কিতাবাদী পড়ার দ্বারা অর্জন হয় না। বরং এই জিনিসগুলো সহবতে থাকার দ্বারা অর্জন হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘আল্লাহ আমাকে শিক্ষক ও সহজকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন (মুসনাদ আহমদ)।’

রাসূলগণ আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন। তাদেরকে পাঠানোর প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহর আদেশে মানুষ যেন তাদের আনুগত্য করে। রাসূলগণের আনুগত্য বা তাদের প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্তের জন্য জাতিকে গণভোটে নামানোর উদ্দেশ্যে রাসূলগণকে পাঠানো হয়নি। শরীয়ত গণবোধের বিষয় নয়। শরীয়ত কোন অপশন নয় যে, ইচ্ছা হলে মানলাম, মনে না চাইলে এড়িয়ে গেলাম। শরীয়তই হলো ইহজীবনের একমাত্র পথ ও পস্থা। শরীয়ত মানতে হবে নইলে পথভ্রষ্টতার আস্তাকুঁড়ে নিষ্কিণ্ড হবে।

এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করার জন্য।

আখিরাত - আখিরাত বা পরকাল ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস, যা ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না। ইসলামী জীবনদর্শনে দুনিয়া হলো একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র এবং আখিরাত হলো তার চিরস্থায়ী ফলাফল। আখিরাত বা পরকাল হলো মৃত্যু পরবর্তী জীবন। যে জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। যে জীবন থেকে কেউ কখনো পলায়ন করতে পারবে না। আখিরাতের জীবন শুরু হয় মৃত্যুর মাধ্যমে।

মৃত্যু হল সবচেয়ে অপ্রিয় সত্য। যা থেকে কেউ রেহাই পাবে না। দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবন শেষে মৃত্যুর মাধ্যমে চিরস্থায়ী জীবনে পাড়ি জমাতে হয়। উলামায়ে কিরাম বলেছেন — ‘মৃত্যু কেবল বিনাশ হয়ে যাওয়া নয় ; বরং মৃত্যু হল — শরীরের সাথে রুহের সাময়িক বিচ্ছেদ, পার্থিব সম্পর্কের সমাপ্তি। মৃত্যু হচ্ছে অবস্থা ও জগতের পরিবর্তন, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর।’

মৃত্যু একটি মহা মুসিবত, বড় বিপদ। পবিত্র কুরআনে মৃত্যুকে বিপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে —

فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ.

সূতরাং তোমাদের উপর মৃত্যুর বিপদ আপতিত হবে।’ সূরা মায়িদা- (৫:১০৬)

তো মৃত্যু অনেক বড় বিপদ এবং বিশাল আবরণ। উলামায়ে কিরাম আরো বলেন, মৃত্যুর চেয়েও বড় বিপদ হল—মৃত্যু সম্পর্কে গাফিল থাকা, মৃত্যুর আলোচনা কে উপেক্ষা করা, মৃত্যু সম্পর্কে কম চিন্তা করা এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করা। যে ব্যক্তি

শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, তার জন্য এক মৃত্যুর মাঝেই রয়েছে প্রভূত শিক্ষা, যে ব্যক্তি চিন্তা করতে চায় তার জন্য মৃত্যুর মাঝেই রয়েছে চিন্তার অজস্র উপকরণ।

মৃত্যুর পরেই শুরু হয় কবরের জীবন। কবর হলো পরকালের জীবনের প্রথম ঘাঁটি। ছোট্ট ঘর, উপরে বাঁশের ছাউনি, তার উপর মাটির চাপা, দুপাশে মাটির বেড়া, অন্ধকার আর অন্ধকার। এটাই হলো আসল ঘর। মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে বারযাখ বলা হয়। এটি দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী একটি পর্দা বা জগত। এখানে কবরের সওয়াল-জওয়াব এবং ভালো বা মন্দ কাজের প্রাথমিক ফল শুরু হয়।

উসমান ইবনু আফফান রাঃ - এর ক্রীতদাস হানি বলেন—উসমান রাঃ যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতে তখন কাঁদতে কাঁদতে তার দাড়ি ভিজে যেত। যার কারণে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—আপনার সামনে তো জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা হলেও এভাবে কাঁদেন না! এখন এভাবে কাঁদছেন কেন? উসমান রাঃ জবাব দিলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

নিশ্চয়ই কবর পরকালের ঘাঁটিগুলোর প্রথম ঘাঁটি। যদি সেখানে মুক্তি পায় তাহলে পরের ঘাঁটিগুলো তারচেয়ে অনেক সহজ হবে। আর যদি সেখানে মুক্তি না পায়, তাহলে পরের মঞ্জিল গুলো আরো বেশি কঠিন হবে।’ সুনানু ইবনু মাজাহ, (হাদিস- ৪২৫৭) বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল ﷺ আরো বলেছেন — ‘আমি কবরের চেয়ে ভয়ংকর কোন দৃশ্য দেখিনি।’

তারপর আসবে সেই সময় যখন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, মানুষ ও জিন জাতি বিনাশ হয়ে যাবে। অতঃপর তারা আল্লাহ তায়ালার আদেশে পুনরুত্থিত হবে।

আবু হুরায়রা রাঃ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি —

‘আল্লাহ জমিনকে তার হাতে নেবেন, আকাশ গুলো তার ডান হাতে নিয়ে দুমড়িয়ে ফেলবেন, তারপর বলবেন —আমিই বাদশাহ; দুনিয়ার বাদশারা কোথায়?’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস -৫২৫৩)

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাঃ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

‘আল্লাহ তাআলা তার আকাশ ও জমিনগুলো নিজের দুই হাতে ধারণ করবেন, তারপর বলবেন— আমি আল্লাহ। তারপর নিজের আঙ্গুলগুলোকে সংকুচিত করবেন এবং প্রশস্ত করে বলবেন —আমিই মালিক।’

বর্ণনাকরি বলেন—এমনকি আমি মিস্বারের দিকে দেখলাম, মিস্বারের নিচুটা কাঁপছে। যার কারণে আমি সহসাই বলে ফেললাম—মিস্বারটি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নিয়ে পড়ে যাবে? (সহিহ মুসলিম, হাদিস -৪৯৯৬)।

এই হাদিসগুলো প্রমাণ করে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করবেন, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা বলবেন—

لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

‘আজকের বাদশাহি কার?’ তারপর নিজের পক্ষ থেকে জবাব দেবেন —

لِلَّهِ الْوَاحِدِ وَالْقَهَّارِ

‘পরাক্রমশালী এক আল্লাহর’। সূরা গাফির- (৪০: ১৬)

তারপর হাশরের মাঠে আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন। বিশাল এক ময়দানে সমস্ত মানবজাতিকে তাদের হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান করা হবে। এটি হবে অত্যন্ত কঠিন ও দীর্ঘ একটি সময়।

কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিতির বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন -

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.

‘ভালোভাবে শোনো, যেদিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে।’

সূরা ক্বফ- (৫০ : ৪১)

কাতাদা রাহিঃ বলেন, আহ্বানকারী হবেন শিঙার ধারক। তিনি বাইতুল মাকদিসের পাথর থেকে আহ্বান করবেন।

ইকরিমা রাহিঃ বলেন, আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে জনৈক আহ্বায়ক এমন ভাবে আহ্বান করবে, যেন সেই আহ্বান হাশরবাসীর কর্ণকুহরে গুঞ্জনিত হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন —

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاللَّيْلُ الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.

‘সেদিন তারা সত্যিসত্যিই মহাচিৎকার শুনবে। সেটিই উত্তীর্ণ হবার দিন। আমিই জীবন দেই এবং আমিই মৃত্যু ঘটাই, আর আমার দিকেই চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন। সেদিন তাদের থেকে যমীন বিদীর্ণ হবে এবং লোকেরা দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে। এটি এমন এক সমাবেশ যা আমার পক্ষে অতীব সহজ।’ সূরা ক্বফ-(৫০: ৪২-৪৪)

সাহান ইবনু সাআদ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন —

‘পরিচ্ছন্ন গোলকের মতো ঝকঝকে সাদা জমিনে কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হবে, যেখানে কোন বস্তুর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস - ৪৯৯৮)।’

তারপর মানুষের ভালো ও মন্দ কাজ পরিমাপ করার জন্য একটি পাল্লা স্থাপন করা হবে। যাকে বলা হয় মিয়ান। সেদিক যার নেকির পাল্লা ভারী হবে, সে সফলকাম হবে। আর যা নেকির পাল্লা হালকা হবে সেই হবে সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.

‘অতএব কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের উপর সাক্ষীরূপে?’ সূরা আন নিসা - (৪ : ৪১)

শ্রেষ্ঠতম সাক্ষী, শ্রেষ্ঠতম বিচার, শ্রেষ্ঠতম বিচারালয়, সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। সেদিন বিচারের প্রধান বিষয় হবে তাওহীদ। যার জন্য বিশ্বজগত সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র ও রব মানা হয়েছিল কি না, এটাই হবে সেদিন বিচারের মূল প্রতিপাদ্য। এজন্যই আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে, নবী-রাসূল পাঠানো হয়েছে, কিতাব নাযিল করা হয়েছে, মিজান-পাল্লায় স্থাপন করা হয়েছে, হিসাব নিকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সেদিন শরীরের চামড়া কথা বলে উঠবে। গাত্রচর্ম কী অনুভব করেছে, সব খুলে বলবে। দুই চোখ কি দেখেছে, বিবরণ দিবে। দুই পা কোন দিকে হেঁটেছে, সাক্ষ্যদানের ভঙ্গিতে সব খুলে বলবে। দুই হাত কোন জুলুমের অংশ নিয়েছে, তার স্বীকারোক্তি দিবে। সেদিন সমস্ত জুলুমের প্রতিকার করা হবে। কোন উকিল সত্যকে উল্টে দিতে পারবে না। সত্যকে মিথ্যা বানাতে পারবে না। সাক্ষী-সাবুদের অভাবে কোন মামলা বন্ধ করে দিতে পারবে না। সেদিন প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রাপ্য পুরোপুরি বুঝে পাবে। জালেম জুলুমের শাস্তি পাবে, মজলুম অধিকার ফিরে পাবে। সেদিন কোন টাকা-পয়সার লেনদেন চলবে না। এমনকি একটি শিংওয়ালা ছাগল আরেকটি শিংবিহীন ছাগলকে অন্যায় ভাবে দুশ দিলে তারও বিচার হবে। দুনিয়াতে ঘটে যাওয়া সামান্যতম জুলুমও বহির্ভূত থাকবে না।

অতঃপর জাহান্নামের ওপর স্থাপিত হবে একটি সূক্ষ্ম ও ধারালো পথ-পুলসিরাত, যা অতিক্রম করে জান্নাতে যেতে হবে। মানুষের ঈমান ও নেক আমল অনুযায়ী এই পথ অতিক্রমের গতি নির্ধারিত হবে।

আবু সাঈদ খুদরি রাঃ বলেন, নবীজি ﷺ বলেছেন—

‘তারপর জাহান্নামের উপর পুল লাগানো হবে এবং শাফায়াতের অনুমতি দেওয়া হবে। তারা বলবে—হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখো! নিরাপদ রাখো। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! পুলটা কেমন হবে? নবীজি ﷺ বললেন—সেটা হবে পিচ্ছিল, হিংস্র থাবা, লোহার পেরেক, এবং নজদে পাওয়া যায় এমন এক ধরনের কাটায়ুক্ত গাছ যাকে ‘السعدان’ বলা হয়। তো মুমিনরা চোখের পলকে পার হয়ে যাবে, কেউ পার হবে বিজলির মতো, কেউ পার হবে বাতাসের ন্যায়, কেউ পার হবে পাখির মতো, কেউ পার হবে দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায়। মুসলিমরা মুক্তি পাবে। আঁচড় খাওয়া ব্যক্তিও গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। কিন্তু কাটাপড়া ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে পড়ে যাবে।....’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৮৩)

আরেক বর্ণনায় আছে, আবু সাঈদ খুদরি রাঃ বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি—

‘পুলসিরাত হবে চুলের চেয়ে চিকন এবং তরবারির চেয়ে দাঁড়ালো।’

অতএব, এখন একটু ভাবুন, পুলসিরাত এবং তার সূক্ষ্মতা দেখলে আপনার মনের অবস্থাটা কেমন হবে! তারপর আপনার চোখ পড়বে নিচে অবস্থিত জাহান্নামের প্রতি। অতঃপর আপনার কানে আসবে জাহান্নামের বিকট গর্জন ও চিংকার। কিন্তু এসব জানার পরও আপনি পুলসিরাতের উপর চলতে বাধ্য। অথচ আপনি দুর্বল, মনটা অস্থির, আপনার পা নড়বড়ে, আপনার পিঠের বোঝা যেখানে বিস্তীর্ণ মাঠেই চলতে বাধা দেয়, তখন এখানে রয়েছে চিকন দাঁড়ানো পুলসিরাত! (ভাবন পরিস্থিতি কতটা নাজুক হবে)।

এক পা পুলসিরাতের উপর রেখে তার ভয়ঙ্কর ধার উপলব্ধি করতে পেরেছেন চরমভাবে, তবুও দ্বিতীয় পা উঠাতে বাধ্য হয়েছেন, ওদিকে আপনার সামনে অনেকেই পিছলে পড়ে যাচ্ছে, কেউ হোচট খাচ্ছে, আবার তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নিশিখা, হিংস্রথাবা এবং পেরেকগুলো খামছে ধরছে। আপনি দেখছেন কিভাবে তারা বুলে পড়ছে, তাদের চেহারাগুলো নিচে জাহান্নামের দিকে আর পাগুলো ওপরের দিকে, তখন আপনার অবস্থা কেমন হবে?

হায়! এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কোন দৃশ্য কি হতে পারে! এর চেয়ে কঠিন চড়াই-উতড়াই কি আর হতে পারে! এর চেয়ে সমস্যাসংকুল চলার পথ কি কোথাও আছে?!

কাফের, মুশরিক এবং মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও আখেরাতকে অস্বীকারকারীরা পুলসিরাতের ওপর এক কদমও এগোতে পারবে না। পুলসিরাতের চারপাশ থাকবে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কাফেরদের কাছে কোনো ঈমানের আলো থাকবে না। সেতুতে ওঠার

সাথে সাথেই তারা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে এবং শুরুতেই নিচের প্রজ্জ্বলিত জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَأَنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۖ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

‘তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে তা অতিক্রম করতে হবে না। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফয়সালা। অতঃপর মুত্তাকীদেরকে আমি রক্ষা করব এবং যালিমদেরকে তার মধ্যে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো।’ সূরা মারইয়াম- (১৯: ৭১-৭২)

মুনাফিকদের অবস্থা হবে সবচেয়ে করুণ ও অপমানজনক। দুনিয়াতে তারা মুসলমানদের সাথে মিশে প্রতারণা করেছিল, তাই পুলসিরাতের গোড়ায় তাদের সাথেও একটি প্রতারণা করা হবে। পুলসিরাতের শুরুতে মুনাফিকদের সাময়িক একটি আলো দেওয়া হবে। কিন্তু তারা যখন কিছুটা সামনে এগোবে, হঠাৎ করেই তাদের আলো সম্পূর্ণ নিভিয়ে দেওয়া হবে।

যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

‘সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা ঈমানদারদেরকে বলবে, ‘আমাদের জন্য অপেক্ষা করো, যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারি।’ বলা হবে, ‘তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান কর।’ অতঃপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীর দাঁড় করানো হবে, যাতে একটি দরজা থাকবে। এর ভিতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।’ সূরা হাদিদ - (৫৭: ১৩)

পুলসিরাত পার হওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার পর মানবজাতির চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে। যারা সফলভাবে পার হলেন, তারা চিরস্থায়ী সুখের নিবাস জান্নাতে প্রবেশ করবেন; আর যারা নিচে পড়ে গেলেন বা যাদের আগেই জাহান্নামে পাঠানো হয়েছে, তারা চিরস্থায়ী কষ্টের নিবাস জাহান্নামে অবস্থান করবেন।

জান্নাত হলো এমন এক স্থান, যা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

‘সেখানে এমন সব নেয়ামত রয়েছে যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও আসেনি (সহীহ বুখারী)।’

জাহান্নাতের ৮টি দরজা রয়েছে। মুমিনরা যখন সেখানে পৌঁছাবেন, তখন ফেরেশতারা তাঁদেরকে সুসংবাদ দিয়ে বলবেন—

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

‘তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা সুখী ও পবিত্র হয়েছ, অতএব চিরকাল বসবাসের জন্য এতে প্রবেশ করো।’ সূরা যুমার- (৩৯ : ৭৩)

জাহান্নাম হলো আল্লাহর অবাধ্য, কাফের, মুশরিক ও পাপাচারীদের শাস্তির জায়গা। এর গভীরতা ও ভয়াবহতা কল্পনাশীল। জাহান্নামের আগুনকে হাজার বছর জ্বালিয়ে লাল, তারপর হাজার বছর জ্বালিয়ে সাদা এবং আরও হাজার বছর জ্বালিয়ে কালো করা হয়েছে। এটি ঘুটঘুটে অন্ধকার ও কালো রঙের আগুন, যার উত্তাপ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি।

জাহান্নামীদের প্রচণ্ড ক্ষুধার সময় খেতে দেওয়া হবে ‘যাক্কুম’ নামক কাঁটায়ুক্ত বিষাক্ত গাছ। এটি পেটে যাওয়া মাত্র ফুটন্ত তেলের মতো ফুটতে থাকবে। আর তৃষ্ণায় দেওয়া হবে ‘হামীম’ (ফুটন্ত গরম পানি) এবং ‘গিসসাক’ (জাহান্নামীদের শরীর থেকে নিংড়ানো পুঁজ ও রক্ত)। এই পানি মুখের কাছে আনতেই মুখের চামড়া খসে পড়ে যাবে এবং পান করা মাত্রই নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

জাহান্নামীরা যখন চিৎকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে বা মৃত্যু কামনা করবে, তখন আল্লাহ বলবেন—

قَالَ اٰخَسَوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ

‘তোমরা এখানেই লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না।’ সূরা মুমিনুন- (২৩ : ১০৮)

আখিরাত কেবল কোনো কাল্পনিক ধারণা বা ভয়ের গল্প নয়, বরং এটি সৃষ্টির এক অমোঘ বাস্তব। বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি, যে এই চিরস্থায়ী সফরের জন্য দুনিয়ার বুক থেকে পাথেয় সংগ্রহ করে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে ঈমান ও নেক আমলের নূর দান করুন, পুলসিরাতের কঠিন পথ সহজ করে দিন এবং তাঁর চিরসুখের জাহান্নামে ফেরদাউস নসিব করুন। আমিন।

১.২ নৈতিকতার সংজ্ঞায় কুরআন

পবিত্র কুরআনের আলোকে নৈতিকতা (اخلاق - আখলাক) হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস এবং বাহ্যিক আচরণের এমন এক সমন্বয়, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী সংকর্ম হিসেবে গণ্য হয়। কুরআন নৈতিকতাকে মানুষের কোনো আবিষ্কার মনে করে না, বরং একে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত ঐশী বিধান বা হেদায়াত হিসেবে বর্ণনা করে।

কুরআন অনুযায়ী, নৈতিকতা হলো আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মানুষের সাথে ভালো আচরণ করা, এমনকি কেউ মন্দ আচরণ করলেও তার সাথে ভালো করা। ‘আল ওয়ারা ওয়াল বারা’ -আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে অপছন্দ করা। এটি মুমিনের ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা তাকে বাতিলের পথ থেকে দূরে রেখে হকের পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করে।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মানবজীবন পরিচালনার জন্য একটা গাইডলাইন দিয়েছেন। এ গাইডলাইন অনুসরণে মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা পরিলক্ষিত হয়। মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা অনেক যোগ্যতা, সৌন্দর্য ও শক্তি নিহিত রেখেছেন। মানুষ জন্মগতভাবে এসবের অধিকারী হয়ে থাকে। ফুল যেমন কলিতে সুপ্ত থাকে, এসব গুণ, শক্তিও মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকে। কলি ধীরে ধীরে ফুলে পরিণত হয়, মানুষও ধীরে ধীরে নিজেকে বিকশিত করে। মানুষের এই বিকাশকেই তাজকিয়া বলা হয়।

এই বিকাশে থাকে শুদ্ধতা ও প্রবৃদ্ধি। আল্লাহ তায়ালা নবী রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন। এসব আয়োজন এর একটা উদ্দেশ্য হলো মানুষের ভেতরে সুপ্ত থাকা সৌন্দর্য শক্তি ও যোগ্যতার যেন শুদ্ধ প্রবৃদ্ধি ঘটে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই তাওহীদ সুপ্ত আছে। একজন মানুষ দীন ও শরীয়তের যথাযথ অনুসরণ করলেই কেবল তাকে শুদ্ধ প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলা যাবে। কুরআন মানুষকে শুদ্ধতর প্রবৃদ্ধির দিকেই আহ্বান করে। কিভাবে শুদ্ধতার প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায় সে শিক্ষা দেয়। কিভাবে সফল জীবন গঠন করা যায়, সে ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দেয়।

অনেকে নিজের সুপ্ত শক্তিকে আবিষ্কার করে কাজে লাগাতে সক্ষম হলেও তাজকিয়া বা আত্মিক শুদ্ধতা অর্জন না করার কারণে সে শক্তির অপব্যবহার করে বসে। কুরআন মানুষকে তাজকিয়ার মাধ্যমে শক্তির যথার্থ ব্যবহার শেখায়। আল্লাহ তায়ালা বান্দার

কাছে চান, যত শক্তি তিনি মানুষকে দিয়েছেন সবটাই কাজে লাগাক। আর সেই শক্তির ব্যবহারটা হোক কুরআন সম্মত উপায়ে। জীবন যাপনের কুরআন সম্মত পদ্ধতিকেই নৈতিকতা বলে।

মানুষকে শুদ্ধ জীবনযাপনের প্রতি উৎসাহী করে তুলতে কুরআন কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। জান্নাতের বর্ণনা করেছে, জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছে। আমাদের কুরআন পড়ার সময় জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্রগুলো ভালো করে আত্মস্থ করে নিলে এবং মনেপ্রাণে গ্রহণ করলে দৈনন্দিন জীবনেও তার প্রভাব পড়বে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাবার সময়ও আমাদের কাছে সেটাকে তুচ্ছ আর নগণ্য মনে হবে। পৃথিবীর সেরা সুন্দরী আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ও আমাদের চোখের পাতা বিন্দুমাত্র নড়বে না। তার দিকে চোখ তুলে চাইতে ইচ্ছা করবে না। তার দিকে তাকাতে ইচ্ছা করলেও জান্নাতি হুরের কথা মনে পড়ার সাথে সাথে দৃষ্টি আপনা আপনি অবনত হয়ে যাবে। কুরআনের বার্তা বান্দার মন-মগজে গেঁথে গেলে দুনিয়ার চাকচিক্য দেখার সাথে সাথেই তার চিন্তার উদ্বেক হবে, এসবের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই; এসব ক্ষণস্থায়ী, এসব মায়া। এগুলোর পেছনে যত বেশি ছুটবো, ততবেশি পিপাসা বাড়বে। তৃপ্তি আসবে না কখনো। আমাদের সামনে আছে চিরস্থায়ী জীবন। সেখানেই চূড়ান্ত পরিতৃপ্তি অপেক্ষা করছে।

কুরআন আমাদের একটা কথাই বলে, দুনিয়াতে আমাদের খায়েশাতের পেছনে ছুটতে পারবো; কিন্তু খায়েশাত কখনোই পুরো করতে পারবোনা। এই বিষয়ে ধনী-গরিব উভয়ই বরাবর। দুজনেই এই দুনিয়া থেকে পিপাসা নিয়েই কবরে যায়। এই দুনিয়াতে কখনোই সব খায়েশাত পুরো হয়না। দুনিয়া হাই খায়েশাত পুরো হওয়ার জায়গা নয়। এজন্য জান্নাতই উপযুক্ত ও একমাত্র স্থান।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.

‘তিনি বরকতময় যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন যেন সে জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে।’ সূরা ফুরকান- (২৫ : ১)

এখানে ফুরকানের অর্থ—হক ও বাতিল, তাওহীদ ও শিরক, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী; যেহেতু কুরআন উক্ত পার্থক্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে, সেহেতু একে ‘ফুরকান’ বলা হয়েছে।

নৈতিকতার অভ্যন্তরীণ চালিকাশক্তি হলো তাকওয়া। কেউ না দেখলেও অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকার কারণে একজন মুমিন গোপনেও পাপাচার থেকে বিরত থাকে। পরকালে প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে—এই বিশ্বাস মানুষকে নৈতিকতার পথে চলতে এবং অন্যায় থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করে।

ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, সুন্দর পস্থা ছাড়া। যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়, আর পরিমাপ ও ওজন ইনসাফের সাথে পরিপূর্ণ দেবে। আমি কাউকে তার সাধ্য ছাড়া দায়িত্ব অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ইনসাফ কর, যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ কর। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।' সূরা আনআম - (৬ : ১৫২)

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বুঝাতে চাচ্ছেন—যে ইয়াতীমের দেখা-শোনার দায়িত্ব তোমাদের উপর আসবে, তার সর্বপ্রকার কল্যাণ কামনা করা তোমাদের উপর ফরয। আর এই কল্যাণ কামনা করার দাবী হল যে, সে যে মাল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে, চাহে তা স্থাবর হোক অথবা অস্থাবর, সে নিজে তা সংরক্ষণ করার যোগ্যতা রাখে না, কাজেই তার এই মালকে সেই পর্যন্ত পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে হিফায়ত করবে, যে পর্যন্ত না সে সাবালকত্বের এবং ভাল-মন্দ বুঝার মত বয়সে পৌঁছে যায়। এ রকম যেন না হয় যে, দেখা-শোনার দায়িত্ব গ্রহণের নামে তার ভাল-মন্দ বোধ জ্ঞান আসার পূর্বেই তার সমস্ত মালকে নিঃশেষ করে দাও।

আবার আদেশ করেছেন ওজনে ও মাপে কম না দিতে। নেওয়ার সময় পুরো মেপে নেওয়া, কিন্তু দেওয়ার সময় এ রকম না করে দাঁড়ি মেরে অপরকে কম দেওয়া হল অতি নীচ এবং জঘন্য চরিত্রের কাজ। শুআইব (আঃ)-এর জাতির মধ্যে চারিত্রিক এই রোগই বিদ্যমান ছিল, যা তাদের ধ্বংসের কারণসমূহের মূল ও প্রধান কারণ ছিল।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন মানুষকে নৈতিকতা শেখানোর জন্য। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন যাতে মানুষ সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারে। একটা সীমারেখা উল্লেখ করে দিয়েছেন যার বাহিরে গেলে

মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটবে। অর্থাৎ ব্যক্তি জীবন পরিচালনার প্রত্যেকটি সুক্ষ সুক্ষ বিষয় আল্লাহ সুবহানা তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

১.৩ আদর্শ সমাজ গঠনে কুরআনের ভূমিকা

আদর্শ সমাজ গঠনে কুরআন হলো পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সামাজিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে একটি শান্তিময় ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। কুরআন শিরক, জুলুম, হিংসা ও অশ্লীলতা দূর করে এবং ব্যক্তিগত পবিত্রতা, পারিবারিক সুদৃঢ়তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি প্রচার করে।

কুরআন নৈতিক ও চারিত্রিক সংস্কার করে। সমাজ গঠনের মূল উপাদান হলো ব্যক্তি। এটি ব্যক্তি পর্যায়ে নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধন করে। মানুষকে শিরক, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, মিথ্যা, অশ্লীলতা, পাপাচার, খুনখারাবি ইত্যাদি সকল ধরনের অন্যায় থেকে মুক্ত করে আদর্শ মানুষ হতে সাহায্য করে। ব্যক্তির উন্নতি হলে সমাজও উন্নত হয়।

কুরআন সমাজে ইনসাফ বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে অন্যায়কে রুখে দেয়। বর্ণ, গোত্র ও বংশের ভেদাভেদ ভুলে শরিয়্যাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়। কুরআনি সমাজ বিশ্বাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলে। সকলে এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে সম্প্রীতি ও সহানুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে একে অপরের বিপদে-আপদে সাহায্য করে। সামর্থ্যবান ব্যক্তির দরিদ্রদের সাহায্য করে। কুরআন যাকাত ও সাদাকার বিধান নাযিল করে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। ধনীর সম্পদের দরিদ্রের হক নির্ধারণ করে দিয়েছি। যার ফলে সামর্থ্যবান চাইলেও নিজের সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখতে পারে না। কুরআন দরিদ্রের অধিকার নিশ্চিত করে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছি।

আদর্শ সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো পরিবার। কুরআন পারিবারিক জীবনকে সুখময়, সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় করার জন্যেও গাইডলাইন প্রদান করেছে। পরিবার গঠনের জন্য জীবনসঙ্গী নির্বাচন থেকে শুরু করে বিয়ে, দাম্পত্য জীবন, সন্তান প্রতিপালন, তারবিয়াত, পারিবারিক জীবনের সকল রসায়ন কুরআন সুনির্দিষ্ট বিধান আকারে নাযিল

করেছে। কুরআনে পিতা-মাতার হক উল্লেখ করা হয়েছে। সন্তান পিতা-মাতার বৃদ্ধ বয়সে তাদের প্রতি কেমন আচরণ করবে তাও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

‘তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন বা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না, তাদের ধমক দিও না, বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।’ সূরা বনী ইসরাইল- (১৭ : ২৩)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পর দ্বিতীয় নম্বরে পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাঁদের খেদমত করার এবং তাঁদের প্রতি আদব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কত যে গুরুত্ব তা পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রতিপালকের প্রতিপালকত্বের দাবীসমূহের সাথে সাথে পিতা-মাতার দাবীসমূহ পূরণ করাও অত্যাবশ্যিক। হাদীসসমূহেও এর গুরুত্ব এবং এর প্রতি চরম তাকীদ করা হয়েছে। বিশেষ করে বার্ধক্যে তাঁদেরকে ‘উঃ’ শব্দটিও বলতে এবং তাঁদেরকে ধমক দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা, বার্ধক্যে তাঁরা দুর্বল ও অসহায় হয়ে যান।

পক্ষান্তরে সন্তানরা হয় সবল এবং উপার্জন-সক্ষম ও (সংসারের সব কিছুর) ব্যবস্থাপক। এ ছাড়া যৌবনের উন্মাদনাময় উদ্যম এবং বার্ধক্যের ভুজ্জপূর্ব স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সব অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি আদব ও শ্রদ্ধার দাবীসমূহের খেয়াল রাখার মুহূর্তটা হয় অতীব কঠিন। তাই আল্লাহর কাছে সন্তোষভাজন সেই-ই হবে, যে তাঁদের শ্রদ্ধার দাবী পূরণ ও প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হবে।

পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার জন্য দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছে —

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

‘তাদের প্রতি দয়া করে বিনয়ের ডানা ঝুঁকিয়ে দাও এবং বলো: ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।’ (সূরা বনী ইসরাইল- ১৭ : ২৪)

কুরআন মাদক, মদ, জুয়া, জিনা, ব্যভিচার, পাপাচার হারাম করে দিয়ে সুশৃংখল সমাজ গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। এ সকল গুনাহের শাস্তিও কুরআনের উল্লেখ রয়েছে।

কুরআনে মাদক সেবন হারাম করে আয়াত নাযিল হয়েছে —

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
‘তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল- এতে রয়েছে বড় পাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও আছে। কিন্তু তাদের পাপ তাদের উপকারের চেয়ে বড়।’
(সূরা আল-বাকারাহ- ২ : ২১৯)

ইসলামের দৃষ্টিতে এটা মহাপাপ। যেহেতু এর ফলে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, গালাগালি ও অশ্লীলতার সৃষ্টি হয়। ইবাদতে বাধা সৃষ্টি হয়, অর্থের অপচয় ঘটে এবং বিদ্বেষ, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার আগমন ঘটে।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ
‘হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও ভাগ্য নির্ধারণের তীর—এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। তাই এগুলো থেকে দূরে থাকো, যাতে তোমরা সফল হও।’
সূরা আল-মায়িদাহ -(৫ : ৯০)

কুরআনে যিনা-ব্যভিচারের ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে। আখিরাতে জন্যে তো শাস্তি আছেই; এমনকি দুনিয়াতেও তাদের জন্য শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
‘আর তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচার করে, তোমরা তাদের উপর তোমাদের মধ্য থেকে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তোমরা তাদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখ যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের জীবন শেষ করে দেয়। অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ তৈরি করে দেন।’ সূরা আন নিসা- (৪ : ১৫)

পরের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে —

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُم فَأَذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
‘আর তোমাদের মধ্যে যারা এ কাজ করে, তাদেরকে শাস্তি দাও। কিন্তু যদি তারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।’ সূরা আন-নিসা (৪:১৬)

অন্য আয়াতের আল্লাহ তায়ালা ব্যাভিচারের শাস্তি উল্লেখ করেছেন—

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
'ব্যাভিচারিণী নারী ও ব্যাভিচারী পুরুষ—তোমরা তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে গিয়ে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে গ্রাস না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। তাদের শাস্তি মুমিনদের একটি দল প্রত্যক্ষ করবে।' সূরা আন নূর-(২৪ : ২)

এভাবে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সতর্ক করেছেন। যাতে মানুষ কুরআনের বিধি-নিষেধ মেনে চলে।

সং কাজের আদেশ এবং অসং কাজের নিষেধ-আমল বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার নীতির মাধ্যমে কুরআন সমাজ থেকে অনাচার দূর করে। কুরআন সমাজ থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, অরাজকতা দূর করে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি হারাম করে ব্যবসায় কে হালাল করে দিয়েছে। শরিয়্য ভিত্তিক ব্যাংকিং সিস্টেমের প্রচলন করে। যার ফলে মানুষ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পায়। জাহিলি সমাজের সকল প্রথা কে কুরআন নিষিদ্ধ করে দিয়েছি। ইসলাম পূর্বে কন্যা সন্তান হত্যার প্রচলন ছিল, যা কুরআন হারাম করে দিয়েছে ও জঘন্য পাপ বলে উল্লেখ করেছে।

ইসলাম যে সমাজকে কতটা পরিবর্তন করতে পারে তা ইসলাম পূর্ব ও পরবর্তী মদিনা রাষ্ট্রের দিকে তাকালে অনুধাবন করা যায়। মদিনায় মুসলিমদের হিজরত নিছক জুলুম থেকে মুক্তি কিংবা মক্কা থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে ছিল না ; বরং এর সাথে হিজরতের মহান একটি উদ্দেশ্য ছিল, নিরাপদ শহরের মুসলিমদের পৃথক এবং আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তখন সকল সক্ষম মুসলিমদের জন্য হিজরত ফরজ ছিল। নিজেদের সমাজ প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাথে অংশগ্রহণ কর্তব্য ছিল। সাথে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নবীজি ﷺ একজন যোগ্য ও পারদর্শী নেতা ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাসুল ﷺ মদিনায় আগমনের পর বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন তিনি এসব সমস্যার প্রেক্ষিতে সরদারে পয়গম্বর সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। যারা অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ত ছিল তাদের অনুগ্রহ করেন আর যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ছিল তাদের জন্য শাস্তি ব্যবস্থা করেন। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব মুসলিমদের হাতে এসে পড়ে।

তারপর রাসুল ﷺ মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। নির্মিত মসজিদ শুধু নামাজ আদায়ের জন্যই ছিল না বরং এটি ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এতে মুসলিমরা ইসলামের মূলনীতি ও হেদায়েত সম্পর্কে শিক্ষার লাভ করতেন। রাসুল ﷺ মসজিদে নববীর নির্মাণের মাধ্যমে পারস্পরিক দিল মোহাব্বতের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তিনি মানব ইতিহাসের এক অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং তা হচ্ছে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি।

এ দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে রাসুল ﷺ একটি নয়া সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। তবে সমাজের বাহ্যিক রূপ আল্লাহ তায়ালা রাসুল কে কেন্দ্র করে বিকশিত ও পরিস্ফুটিত হয়েছিল। তার মোহনীয় ব্যক্তিত্ব ছিল সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নৈতিক চরিত্র গঠনের উপাদান, ভ্রাতৃত্বের নমুনা, ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্য মুসলিমদের নবজীবন লাভে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

এভাবেই কুরআনী শিক্ষার মাধ্যমে রাসুল ﷺ একটি জাহেলী সমাজকে আলোর পথ দেখিয়ে ছিলেন।

অধ্যায়-২ নৈতিক অবক্ষয়

কুরআন থেকে বিচ্ছিন্নতা মানব জীবন বিশৃঙ্খলার প্রধান কারণ। কুরআন শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং এটি মানব জীবনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। যখনই মানুষ কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তখনই তার জীবনে ছন্দপতন ঘটবে। এই ছন্দপতন শুধু ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সকল ক্ষেত্রেই এর প্রভাব বিস্তার করে। নৈতিকতা হীন মানুষ পশুর মত। বরং পশুর চেয়েও অধম।

২.১ তাকওয়া হীনতা ও আখিরাত বিমুখতা

তাকওয়া হীনতা ও আখিরাত বিমুখতা হলো মুমিনের ঈমানী দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ, যা মানুষকে অন্যায়, অবিচার ও গুনাহের দিকে ঠেলে দেয়। তাকওয়া বিহীন অন্তর আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে গাফেল থাকে। যার অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহ তাআলার ভয় নেই, তার মধ্যে ঈমানী শূন্যতা বিরাজ করে। তাকওয়াহীন ব্যক্তি সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। অন্যায় ও গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না। তাকওয়া হীনতার পরিণাম সম্পর্কে কুরআনে বহু জায়গায় সতর্কতা এসেছে। আল্লাহর ভয় ও সচেতনতা (তাকওয়া) ছাড়া জীবন মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

‘তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেও ভুলিয়ে দিয়েছেন। তারাই তো ফাসিক।’ সূরা আল-হাশর (৫৯:১৯)

অর্থাৎ, আল্লাহ শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে এমন করে দিলেন যে, তারা এমন সব কাজ করা থেকে উদাসীন হয়ে গেল যাতে ছিল তাদের উপকার এবং যার দ্বারা তারা নিজেদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাতে পারত। এইভাবে মানুষ আল্লাহকে ভুলে আসলে নিজেদেরই ভুলে যায়। তার জ্ঞান-বুদ্ধি তাকে সঠিক দিক-নির্দেশনা করে না। চোখ দু’টি তাকে সঠিক পথ দেখায় না এবং তার কান সত্য কথা শুনতে বধির হয়ে যায়। ফলে তার দ্বারা এমন কাজ হয়ে যায়, যাতে থাকে তার নিজেরই ধ্বংস ও বিনাশ।

ইরশাদ হয়েছে—

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

‘যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী থেকে বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ফলে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করেছি।’ সূরা আল-আ‘রাফ (৭:৯৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

‘জেনে রেখো, শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে; তা যখন সংশোধিত হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন সংশোধিত হয়ে যায়। আর তা যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, গোটা শরীরই তখন ধ্বংস হয়ে যায়। জেনে রেখো, সেটি হলো কলব (অন্তর)।’ (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বুক বা অন্তরের দিকে ইশারা করে তিনবার বলেছিলেন— ‘তাকওয়া এখানে থাকে।’ অর্থাৎ অন্তরে তাকওয়া বা খোদাভীতি না থাকলে মানুষের পুরো জীবনই পাপে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

তাকওয়াহীন ব্যক্তি ওহীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে না, অল্পে তুষ্ট থাকে না এবং বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না। দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্যে মগ্ন হয়ে আখিরাতকে ভুলে থাকে। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জবাবদিহিতা ও বিচার সম্পর্কে গাফেল থাকে। কুরআনে আখিরাত বিমুখতার ব্যাপারে বহু আয়াত এসেছে, যেখানে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা দুনিয়ার মোহে পড়ে আখিরাতকে ভুলে না যায়।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۝
‘জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবন তো কেবল খেলা, আমোদ-প্রমোদ, সাজসজ্জা, তোমাদের মধ্যে অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রতিযোগিতা।’ সূরা আল-হাদীদ (৫৭:২০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

‘দুনিয়ার মোহ (ভালোবাসা) হচ্ছে সমস্ত পাপের উৎস।’ (বায়হাকি, মিশকাত)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

‘যারা আখিরাতের সাক্ষাতের আশা করে না এবং দুনিয়ার জীবনেই সন্তুষ্ট ও তাতে নিশ্চিত থাকে, আর যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি উদাসীন—তাদের ঠিকানা হবে আগুন।’ সূরা ইউনুস (১০:৭)

তাকওয়া মানব অন্তরের এমন এক অবস্থা যা আল্লাহ প্রতি ভয় সৃষ্টি করে এবং দুনিয়ার জীবনে আখিরাতের সামান্য গুছাতে সাহায্য করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

‘যার মূল চিন্তার বিষয় হবে আখিরাত, আল্লাহ তার অন্তরকে অভাবমুক্ত (ধনী) করে দেবেন, তার বিচ্ছিন্ন কাজগুলোকে গুছিয়ে দেবেন এবং দুনিয়া তার কাছে বাধ্য হয়ে (অপমানিত হয়ে) আসবে। আর যার মূল লক্ষ্য বা নিয়ত হবে দুনিয়া, আল্লাহ অভাবকে তার দুই চোখের সামনে এনে দেবেন, তার গোছানো কাজগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন এবং দুনিয়া থেকে তার ভাগ্যে যতটুকু নির্ধারিত আছে, তার বেশি সে পাবে না।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৪৬৫)

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতই চিরস্থায়ী। তাকওয়া অবলম্বন করার অর্থ হলো আল্লাহর আদেশ মেনে চলা ও নিষেধ থেকে দূরে থাকা, যা মানুষকে আখিরাতমুখী করে তোলে।

২.২ সততা ও আমানতদারিতার অভাব

সততা ও আমানতদারিতা মানব জীবনের এক অন্যতম প্রধান গুণ। সততার অভাব ও আমানতের খেয়ানত করা ভয়াবহ অপরাধ এবং মুনাফিকের লক্ষণ। এগুলো একজন মানুষের ঈমানী দুর্বলতা প্রকাশ করে।

হাদিসে এসেছে রাসূল ﷺ বলেছেন —

‘যার আমানতদারিতা নেই তার ঈমান নেই।’ (আহমদ)

অসৎ ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না। যার কারণে সব ধরনের গুনাহে লিপ্ত হতে পারে। নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের ক্ষতি করে। এদের দ্বারা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সব সময় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দেশ ও জাতির জন্য এরা আবর্জনা।

হাদিসে এসেছে রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি : কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা ভঙ্গ করে ও আমানতের খেয়ানত করে।’ (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ হাদিসের আলোকে আমানতের খেয়ানতকারী বিশুদ্ধ মুনাফিক। খেয়ানত করা কবির গুনাহ। খিয়ানতকারী জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা এতিমের সম্পদ রক্ষা, ন্যায়সঙ্গত মাপ-ওজন, ন্যায্য সাক্ষ্য প্রদান এবং আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ

‘এতিমের সম্পদের কাছে যেও না, তবে উত্তম উপায়ে, যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়।’

সূরা আনআম (৬:১৫২)

এই আয়াতের আল্লাহ তায়ালা আমানতদারীতার শিক্ষা দিয়েছি। আল্লাহ তায়ালা বলেননি, ‘ইয়াতীমদের সম্পদ খরচ করো না।’ বরং সত্য হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, ‘ইয়াতিমের সম্পত্তির কাছেও যেও না।’

যাতে করে ইয়াতীমদের সম্পদের কথা কারও চিন্তায়ও না আসে। এরপর বলেননি, ‘তবে ন্যায় সঙ্গতভাবে খরচ করতে পারবে।’ বরং বললেন, ‘করতে হলে সর্বোত্তম ভাবে খরচ করব।’

অর্থাৎ, তারা সাবালক হওয়ার আগ পর্যন্ত যদি তাদের সম্পদে পুনরূপ হস্তক্ষেপ করতেই হয়, তবে ভেবেচিন্তে করবে। তাদের প্রয়োজনের খরচাপাতি এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় এই উভয়ের মাঝে ভারসাম্য রাখতে হবে। সর্বোত্তম পন্থা মানে যেখানে ইয়াতীমদের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধিত হয়। এরপর যখন তারা সাবালক হয়ে যাবে, নিজেদের বিষয়গুলো নিজেরা সামলাতে শিখবে, তখন ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের বাকি সম্পদ।

সততার অভাবে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নষ্ট হয়। অসৎ পন্থা অবলম্বন করে অন্যের হক নষ্ট করে গুটি কয়েক মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ে। যার কারণে দরিদ্র, অসহায় মানুষদের ভুক্তভোগী হতে হয়। অসৎ ব্যবসায়ীরা পন্য সামগ্রীতে বিভিন্ন অস্বাস্থ্যকর জিনিস মিশিয়ে পন্য সংরক্ষণ করে রাখে বেশি সময় ধরে ভালো রাখার জন্য। যা মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। পন্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পন্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। মিথ্যা কথা বলে ফেইক জিনিস বিক্রি করে। এসকল কিছু করে শুধু মাত্র নিজের স্বার্থের জন্য। যা সততা নামক সৎ গুণ না থাকার কারণে করে থাকে।

কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা সততা ও আমানতদারিতার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর বাহিরে কেউ গেলে তাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। এবং কিয়ামত দিবসে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২.৩ হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার

হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার মানুষের অভ্যন্তরীণ চরিত্র ও ঈমানের মারাত্মক ব্যাধি, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে কলুষিত করে এবং নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। ইসলাম এগুলোকে হারাম করে দিয়েছি। হিংসা হল অন্য কারো নিয়ামত বা উন্নতি দেখে সহ্য করতে না পারা এবং তার ধ্বংসের কামনা করা। ইসলামে এটি অনেক বড় গুনাহের কাজ।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন—

‘তোমাদের মধ্যে পূর্ববর্তী জাতির রোগ প্রবেশ করেছে—হিংসা ও বিদ্বেষ। এগুলো দ্বীনকে মুন্ডন করে দেয়, যেমনভাবে ক্ষুর চুল মুন্ডন করে।’ (সহীহ হাদিস)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন—

‘তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, হিংসা করো না, সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও।’ (বুখারী, মুসলিম)

এটি মানুষের ঈমান ও নেক আমল কে সেইভাবে ধ্বংস করে যেভাবে আগুন শুকনো লাকড়িকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। হিংসা হিংসুটের অন্তরে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মতো অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং মানুষে মানুষে শত্রুতার সৃষ্টি করে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করে। সমাজ সংসারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

অহংকার অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত একটি হারাম কাজ। যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দেয়। অনেক সময় অহংকার মুখে প্রকাশ পায় না। বরং মুখের যে এমন বলে যে আমি অনেক তুচ্ছ, আমি অযোগ্য, আমি কিছুই না। কিন্তু তার অন্তর অহংকারে ভরপুর থাকে। এভাবে যে, সে অন্যকে তুচ্ছ মনে করে। এই অহংকার অন্তরের গোপনীয় রোগ।

অহংকার এত মারাত্মক হারাম যে, শূকরের গোশত খাওয়ার চেয়েও বেশি হারাম। মদ পান করার চেয়েও বেশি হারাম। এ কারণে যে, অহংকারকারী মূলত আল্লাহ তাআলার

সঙ্গে যুদ্ধকারী। অহংকার এবং শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য শোভা পায়। এখন যে ব্যক্তি এটা বলে যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ সে মূলত আল্লাহ তাআলার মোকাবেলা করছে। মোটকথা, অহংকার অনেক বড় খারাপ জিনিস এবং হারাম।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন—

‘যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’

সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন: সুন্দর পোশাক বা জুতা পরা কি অহংকার?

নবী ﷺ বললেন—

‘আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। অহংকার হলো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।’ (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِفٍ
‘মানুষের প্রতি অবজ্ঞার ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং পৃথিবীতে অহংকারভরে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো আত্মগর্বী অহংকারীকে ভালোবাসেন না।’
সূরা লোকমান -(৩১:১৮)

অর্থাৎ, অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। এমন অহংকার করো না, যাতে তুমি মানুষকে তুচ্ছ ভাবো ও তাকে ঘৃণা কর এবং কোন মানুষ তোমার সাথে কথা বললে তার থেকে বৈমুখ হও অথবা কথোপকথনের সময় নিজ মুখমন্ডলকে অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখো। صعر এক প্রকার ব্যাধি, যা উটের মাথা অথবা ঘাড়ে হয় এবং যার ফলে সেই উটের ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়। এখানে অহংকার হেতু মুখ ফিরিয়ে নেওয়া (বা মুখ বাঁকানো)র অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۖ
‘যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে তর্ক করে অথচ তাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই—
এটি আল্লাহর কাছে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী জালেমের অন্তরে সীলমোহর বসিয়ে দেন।’ সূরা গাফির
(৪০:৩৫)

মূলত, অহংকার মানুষকে একা করে, হিংসা অন্তরের শান্তি কেড়ে নেয়, আর বিদ্বেষ হৃদয়টাকে কঠিন করে, যা মানুষকে ধীরে ধীরে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়।

২.৪ অপচয় ও ভোগবাদ

অপচয় ও ভোগবাদ একটি মানসিক ব্যাধিতে রূপ ধারণ করেছে। মানুষের আরো বেশি চাই মনোভাব মানুষকে অল্পতে তুষ্ট থাকতে দেয় না। যার কারণে অপচয় বেড়ে যায়। বর্তমান বিশ্বে ভোগের প্রতিযোগিতা মানুষকে আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

বর্তমান সমাজ পন্যের উৎপাদন ও ভোগকে আধুনিকতা বলে আখ্যায়িত করে। বিজ্ঞাপন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভোগের প্রতি উৎসাহিত করে।

বৈধ কাজের প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় কে অপচয় বলে। আর অবৈধ কাজে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যয় কে অপব্যয় বলে। বর্তমানে মানুষ অপচয় ও অপব্যয় হরহামেশা করে যাচ্ছে। কুরআনিক বিধান থেকে সরে গিয়ে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

‘নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।’ সূরা বনী ইসরাঈল- (১৭:২৭)

এই আয়াতে অপব্যয়কারীকে শয়তানের সহোদর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ শয়তান যেমন আল্লাহ তাআলার অবাধ্য করেছে, অপব্যয়কারীরাও শয়তানের অনুসরণ করে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করছে। আর শয়তান চিরস্থায়ী জাহান্নামী। মিতব্যয়িতা আল্লাহর দেওয়া রিজিকের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রতীক এবং অপচয় আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

দুনিয়ার চাকচিক্য মানুষের মনকে আল্লাহ বিমুখ করে তোলে এবং অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। ফলে মানুষ সব সময় নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করে হতাশায় ভোগে। কে কত বেশি খরচ করতে পারে তার প্রতিযোগিতায় নামে। ভোগবাদী সমাজের মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ঋণে জর্জরিত থাকে এবং সঞ্চয়হীন হয়ে পড়ে। তখন অর্থনৈতিক অবস্থা নড়বড়ে হয়ে যায়। আধুনিক চাকচিক্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে মানুষ পরিবার গঠনের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়ে যাচ্ছে। দাম্পত্য জীবনের ধ্বস নেমে আসছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন —

‘খাও, পান করো, দান করো এবং পোশাক পরো অহংকার ও অপচয় ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর তাঁর নেয়ামতের প্রভাব দেখতে ভালোবাসেন।’ সুনান নাসায়ী (হাদিস-২৫৫৯)

কুরআন বিলাসিতা নিষিদ্ধ করেনি কিন্তু অপচয় ও অহংকার প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছে। আধুনিক ভোগবাদী চাকচিক্য থেকে বাঁচতে কুরআনিক মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ করে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে হবে। কুরআনিক মিতব্যয়িতা মানুষকে প্রকৃত সুখ অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে। গোটা দুনিয়ার সমস্ত ভোগ বিলাস একসাথে মেলালে আখেরাতের বিচারে সেটা নিতান্তই তুচ্ছ নগণ্য। এই নগণ্য সামান্য ভোগ থেকে আমাদের ভাগে যা কিছু আসে সবই তুচ্ছ-নগণ্য-যতকিঞ্চিৎ- অপাঙতেয়।

২.৫ আত্মিক অস্থিরতা ও হতাশা

আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যাওয়া একজন মুমিনের জীবনে আত্মিক অস্থিরতা ও ডিপ্রেশনের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

কুরআন বলে আত্মা তখনই প্রশান্তি পায় যখন আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকে। যখন আল্লাহর সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয় তখন পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। শয়তান ওয়াসওয়াসা দিয়ে গুনাহের কাজে উৎসাহী করে।

পাপ অন্তরকে দুর্বল করে দেয়। আল্লাহর পথে চলতে এবং আখেরাতের রসদ যোগাতে অন্তরের যে শক্তি প্রয়োজন তা পাপ দুর্বল করে দেয়। মানুষকে দুশ্চিন্তায় ও ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় ভোগায়। মানুষের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে। ফলে নেক কাজের শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। পাপের ফলে মানুষের মধ্যে ভীৰুতা ও কৃপণতা প্রকাশ পায়। শারীরিক ক্ষতির ভয়ে উপকারী বিষয় হতে বিরত থাকে এবং সম্পদ হারানোর ভয়ে দান সাদাকা থেকে দূরে থাকে। পাপ বিপদ-আপদ, খারাপ পরিণতি, দুর্ভাগ্য, এবং শত্রুর বিদ্বেষকে টেনে আনে। এছাড়াও আল্লাহর নিয়ামত লাভের পথে অন্তরায়। তাঁর শান্তি ও ক্রোধ থেকে পরিধান পাবার পথ বন্ধ করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

‘আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্য অবশ্যই রয়েছে সংকীর্ণ জীবন, এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্র করব।’ সূরা ত্বাহা - (২০:১২৪)

সংকীর্ণ জীবন মূলত আত্মিক অস্থিরতা, হতাশা এবং অন্তরের অশান্তিকে নির্দেশ করে। আত্মিক ব্যাধিগুলোর ভয়াবহ পরিণতি হলো, এগুলো বান্দাকে আখেরাতে জাহান্নামী করে। এমনকি দুনিয়ার জীবনকেও জাহান্নাম বানিয়ে ছাড়ে।

কুরআন মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে। এটি থেকে দূরে সরে গেলে মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না, যা দীর্ঘমেয়াদী হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যখন কেউ আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়, তখন তার ওপর নেতিবাচক চিন্তা ও কুপ্ররোচনা আধিপত্য বিস্তার করে, যা অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে দেয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ُ

‘যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়। জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।’ সূরা র’দ (১৩:২৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

‘আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্ত হয়।’ (তিরমিযী)

তাই স্মরণ থেকে দূরে গেলে অন্তর অশান্ত ও হতাশায় নিমজ্জিত হয়।

অন্য হাদিসে এসেছে—

‘যে আল্লাহকে স্মরণ করে আর যে করে না, তাদের উদাহরণ জীবিত ও মৃতের মতো।’ (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণহীন জীবন আত্মিকভাবে মৃতপ্রায় হয়ে যায়।

কুরআন ও হাদীস উভয়েই শিক্ষা দেয় যে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকা মানেই আত্মিক অস্থিরতা, হতাশা ও আখেরাতে ভয়াবহ পরিণতি। আর আল্লাহর স্মরণে রয়েছে প্রশান্তি, আশা ও আত্মার জীবন।

২.৬ অশ্লীলতা ও চারিত্রিক পতন

অশ্লীলতা বলতে সাধারণত এমন সব কথা, কাজ বা বিষয়কে বোঝায় যা মার্জিত রুচি, নৈতিকতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। অশ্লীলতা অন্তরের দৃঢ়তা ও রুহানিয়াত নষ্ট করে দেয়। পাপাচারের দিকে ধাবিত করে। আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের অশ্লীলতা হারাম করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ.

‘আর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কোন ধরনের অশ্লীলতার ধারে-কাছেও যেও না।’ সূরা আনআম (৬:১৫১)

আল্লাহ তায়ালা এখানে বলেননি, “অশালীন কাজ করো না।” বরং বলেছেন, “অশালীন কাজের ধারে কাছেও যেও না।” অর্থাৎ কবির গুনাহের দিকে নিয়ে যায় এমন প্রত্যেক বিষয়কে এখানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে জিনিস ব্যক্তি আর কবির গুনাহের মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে দেবে, তাই- নিষিদ্ধ।

উদাহরণস্বরূপ :

- কোন হারাম বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া।
- নারী-পুরুষ নির্জনে একত্রিত হওয়া।
- চরিত্র বিধংসী গান-বাজনা।

যে ব্যক্তি এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল, সে আল্লাহ আদেশের খেলাফ করে গুনাহগার হয়ে গেল। কারণ এ-কাজগুলো সরাসরি অশালীন না হলেও এগুলো চূড়ান্ত গুনাহের পথে কে উন্মুক্ত করে দেয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—

‘লজ্জাশীলতা ও ঈমান উভয়ই একসাথে মিশে আছে। যখন এর একটি তুলে নেওয়া হয়, তখন অন্যটিও তুলে নেওয়া হয়।’ (বায়হাকি, শুআবুল ঈমান; মিশকাত, হাদিস: ৫০৮৩)

অশ্লীলতার প্রসার ব্যক্তির চারিত্রিক দৃঢ়তা শিথিল করে দেয়। অনবরত অশ্লীলতার মধ্যে ডুবে থাকলে মানুষের বিবেকবোধ লোপ পায়। ভালো-মন্দের, ন্যায়-অন্যায়, এসবের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। দাম্পত্য জীবনের আস্থা নষ্ট করে এবং পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করে। ফলে যিনা-ব্যভিচার বেড়ে যায়।

চরিত্রের পতন এবং মুখে অশ্লীল কথা বলা মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। হাদিসে এসেছে—

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কোনো অশ্লীলভাষী ও কটুভাষী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২০০০)

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

‘কেয়ামতের দিন মুমিনের আমলনামায় সুন্দর চরিত্রের চেয়ে ভারী কোনো জিনিস থাকবে না। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও কটুভাষী ব্যক্তিকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২০০২)

চরিত্র হচ্ছে মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। অশ্লীলতা এই সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। তাই একটি সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গড়তে আমাদের প্রত্যেকের উচিত ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে নৈতিকতা ও শালীনতা বজায় রাখা।

২.৭ হত্যা ও পাপাচার

হত্যা ও পাপাচার একটি সমাজ ও জাতির নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। যখন কোনো সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব দেখা দেয়, তখন মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের পাপাচার শিকড় গেড়ে বসে।

মানুষকে হত্যা করা আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছে এর মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম (আশ্রিত চুক্তিবদ্ধ বেসামরিক অমুসলিম) উভয়-ই অন্তর্ভুক্ত। মানুষকে হত্যা করে ফেলা যাকে আল্লাহ তাআলা মহিমাম্বিত করেছেন তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটা শুধু একটা হত্যাই নয় বরং সরাসরি আল্লাহর সাথে শত্রুতার শামিল আল্লাহর হকের মাঝে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর।

হত্যাকারী একটা প্রাণ কেড়ে নিল। কিন্তু তাকে একবারও এ বিষয়টি নাড়া দিল না যে, এই প্রাণ-পাখির মালিক আল্লাহ তাআলা একে পরম যত্নে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইবাদতের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। বড় অপরাধ আর কি হতে পারে?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ

‘এবং আল্লাহর নিষেধ করেছেন, এমন কোন প্রাণকে বৈধ কারণ ছাড়া হত্যা করো না।’

সূরা আল-ইসরা (১৭:৩৩)

স্বাভাবিকভাবে শারয়ী কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা নিঃসন্দেহে হারাম ও গুনাহের কাজ। কিন্তু রাগের মাথায়, টাকার লোভে বা এ-ধরনের কোন কারণে কাউকে হত্যা করার চেয়েও জঘন্য একটি অপরাধ আছে। রিজিক কমে যাওয়ার ভয়ে নিজ সন্তান সন্ততি হত্যা করা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

‘আর দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না—আমরা তোমাদের ও তাদেরকে রিজিক দিই।’ সূরা আনআম (৬:১৫১)

এখন ভাবার বিষয়, অন্যান্য সকল প্রকার হত্যার চাইতে এই হত্যা বেশি জঘন্য কেন? কারণ, আল্লাহর নাম ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে যার ঈমানে ত্রুটি আছে, শুধু তার পক্ষেই সম্ভব এহেন পাপ কাজ করা। আল্লাহ তাআলা যে আর-রাজ্জাক এ ব্যাপারে তার সংশয় আছে। যেন আল্লাহর রিজিক সংকীর্ণ, সন্তান এখানে ভাগ বসালে, রিজিক থেকে কমে যাবে! ওয়া হা-শা লিল্লাহ!

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ ধরনের ঈমান বিধ্বংসী পাপাচার থেকে রক্ষা করুন! আমিন।

অধ্যায়-৩ সামাজিক সংহতি ও পারিবারিক ভাঙন

সামাজিক অসংহতি হলো এমন একটি অবস্থা যখন সমাজের প্রচলিত নিয়ম-কানুন, মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমন: পরিবার, শিক্ষা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) আর সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। সহজ কথায়, সমাজের ভেতরের শৃঙ্খলা যখন ভেঙে পড়ে এবং মানুষের মধ্যে ঐক্য বা সংহতির অভাব দেখা দেয়, তাকেই সামাজিক অসংহতি বলা হয়। অর্থাৎ যখন মানুষ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব না করে এবং নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; যখন মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ, বিবেক-বোধ লোপ পায়; যখন পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে— তখন সামাজিক অসংহতি দেখা দেয়।

সামাজিক অসংহতি মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, পারিবারিক কাঠামো নড়বড়ে করে দেয়, সুন্দর, সুশৃংখল ও স্থিতিশীল সমাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের মধ্যে অপরাধ বৃদ্ধি পায়। ফলে চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হত্যা, যিনা-ব্যভিচার, মাদকাসক্তি মত অপরাধের হার বেড়ে যায়। বিবাহ বিচ্ছেদ ও পারিবারিক কলহ বৃদ্ধি পায়। অনিশ্চিত ও বিশৃংখল পরিবেশের কারণে মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও হতাশা বেড়ে যায়।

সুতরাং, সামাজিক অসংগতি ও পারিবারিক ভাঙন সমাজের একটি অসুস্থতা, যা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সমাজ সঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তাই কুরআনিক অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করে সমাজে সংহতি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে।

৩.১ পারিবারিক কাঠামো ধ্বস

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ গঠনের মূল উপাদান হলো পরিবার। পরিবার কাঠামো সুন্দর ও সুদৃঢ় হলে সমাজ কাঠামো সুশৃংখল ও সুসংহত হয়। বর্তমানে পরিবার কাঠামো বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হলো কুরআনিক শিক্ষার অভাব। কুরআন পারিবারিক সম্পর্কের প্রতিটি স্তরের অধিকার ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কুরআন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে পোশাকের সাথে তুলনা করেছে যা সুরক্ষা ও সৌন্দর্যের প্রতীক।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

هَٰذَا لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ

‘তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।’ সূরা বাকারাহ (২:১৮৭)

কিন্তু বর্তমানে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি সম্মান ও দয়া প্রদর্শনের পরিবর্তে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে নেমেছি। স্বামী তার স্ত্রীর অধিকারের বিষয়ে অজ্ঞ এবং স্ত্রীও স্বামীর অধিকারের বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে দাম্পত্য জীবনের তিক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের হার বেড়ে চলছে।

পারিবারিক কাঠামোর অন্যতম প্রদান স্তম্ভ হল পরবর্তী প্রজন্ম। কুরআন লুকমান হাকিমের উপদেশের মাধ্যমে সন্তানকে তাওহিদ, সালাত ও ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছি। পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছে।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ۖ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

‘আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয়েছে দুই বছরে। তুমি আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।’ সূরা লোকমান (৩১:১৪)

আল্লাহ তায়ালা মা-বাবার সাথে সন্তানের আচরণকে শুধু মমতাপূর্ণ করারই আদেশ করেনি, পাশাপাশি আচরণকে বিনয়াবনত রাখার আদেশ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে সন্তানরা নৈতিক দিক থেকে আদর্শহীন হয়ে বড় হচ্ছে। ফলে পিতা মাতার সাথে দুর্ব্যবহার করছে এবং বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতাকে অবহেলা করে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসছে। এছাড়াও সংসার জীবনে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি অহংকার ও জেদ জন্ম দিচ্ছে। ধৈর্যের অভাবে মানুষ খুব সহজেই তালাকের পথ অবলম্বন করছে। পর্দা ও শালীনতার অভাবে পারিবারিক পরিবেশে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মেলামেশা পরকীয়ায় রূপ নিচ্ছে। রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা না করার কারণে এসব আরো দিন দিন বেড়ে চলছে।

সংসারে শাশুড়ী বউমার কোন্দল তো দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। জেনারেশন গ্যাপের কারণে অনেক কিছু ভিন্ন হয়। ধৈর্যের অভাবে বউমা শাশুড়ী কে প্রতিপক্ষ মনে করে। শ্বশুর- শাশুড়ীকে শ্রদ্ধা করে না। বৃদ্ধ বয়সে শ্বশুর- শাশুড়ী কে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসতেও দু-বার ভাবে না। শাশুড়ী সমাজ ছেলের বৌ কে এক চুল ছাড় দিতে রাজি থাকে না। অনেক পরিবারে ছেলের বৌ কে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়।

সহ্য করতে না পেরে অনেক বউমা নিজে থেকেই শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে যায়। যার ফলে পরিবার কাঠামোতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়।

কুরআন হলো সেই সুতো যা পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে এক সুশৃঙ্খল মালায় গেঁথে রাখে। এই সুতোর অনুপস্থিতিতে মালার দানাগুলো যেমন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়, কুরআনিক শিক্ষার অভাবে পরিবার কাঠামোর অবস্থাও ঠিক তেমনি শোচনীয় হয়ে পড়ে।

৩.২ প্রতিবেশীর হক ও সামাজিক দূরত্ব

মানবীয় সম্পর্কের সেতুবন্ধনের ধারাবাহিকতায় ইসলামী জীবনব্যবস্থা পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে যে সমুন্নত মর্যাদা দান করেছে, পূর্ববর্তী কোন শরীয়ত যেমন এর কানাকড়িও দিতে পারেনি, তেমনি পরবর্তী কোন মানবরচিত মতবাদও এর কাছে আসতে সক্ষম হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম বান্দাকে এর তাৎপর্য বুঝতে হবে।

কুরআনিক শিক্ষার অনুপস্থিতি কেবল পরিবার নয়, বরং সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ 'প্রতিবেশীর হক' বা অধিকারকেও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইবাদতের পাশাপাশি মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যার অভাবে বর্তমান সমাজে গভীর দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করো। আর সদ্যবহার করো আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথি, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাস্তিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।’ সূরা আন-নিসা (৪:৩৬)

আপনার বাসস্থানের আশেপাশে যেই বাস করুক আপনার উপর তার প্রতিবেশীত্বের অধিকার রয়েছে। আপনার সাথে তার বংশীয় বা ধর্মীয় কোন ধরনের সম্পর্ক থাকুক বা নাই থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না, সে আপনার পাশে থাকে এটাই মূল বিবেচ্য

বিষয়। প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণে ইসলামের এ বিধান তাদের সম্মান ও মর্যাদাকে কতটুকু বুলন্দ করেছে সহজেই অনুমেয়। এজন্যই রাসূল ﷺ অনেক হাদিসে বংশীয় বা ধর্মীয় যোগাযোগের দিকে আক্ষেপ না করে প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি ﷺ বলেন—

‘জিব্রাইল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত বেশি নসিহত করতেন যে আমার মনে হতো তিনি হয়তো তাদেরকে আমার সম্পদের উত্তরাধিকারী পর্যন্ত বানিয়ে দেবেন।’
(বুখারী ও মুসলিম)

কুরআন মুসলিম উম্মাহকে একটি শরীরের মতো বিবেচনা করে। যখন কুরআনের ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা বিলুপ্ত হয় তখন মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। প্রতিবেশীর চুলায় আগুন জ্বললো কিনা বা প্রতিবেশী কেউ অসুস্থ কিনা—তা জানার প্রয়োজন বোধ করে না। সামর্থ্যবানেরা অসহায়-দুর্বলদের সাহায্য করার সুযোগ থাকা স্বত্বেও সাহায্য এগিয়ে আসে না। অর্থের অভাবে প্রতিবেশী অসুস্থ হয়ে বিছানায় পরে থাকে। কিন্তু অর্থ ওয়ালা প্রতিবেশী সাহায্য করে না। যার ফলে প্রতিবেশীদের সাথে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কুরআন শেখায় যে, আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো— তাকওয়া বা খোদা ভীতি। কিন্তু কুরআনিক জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ দরিদ্র প্রতিবেশীকে তুচ্ছজ্ঞান করে। দরিদ্র প্রতিবেশী কে বাসায় কোন বিয়ে-শাদী হলে দাওয়াত করে না। এই অর্থনৈতিক ও মানসিক বিভেদ সমাজের সংহতি পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

এছাড়াও কুরআনিক শিক্ষার অভাবে প্রতিবেশীর জায়গায় অনধিকার প্রবেশ, চলাচলের পথ বন্ধ করা, কিংবা উচ্চশব্দে গান বাজিয়ে বা ময়লা ফেলে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা কুরআন হারাম করে দিয়েছে।

প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা ঈমানের একটি অংশ। কুরআনিক শিক্ষা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা দূর করে প্রতিটি মানুষকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে গড়ে তোলে। এই শিক্ষার পুনর্জাগরণই পারে আধুনিক নগরায়নের এই ‘একাকীত্ব’ ও ‘সামাজিক দূরত্ব’ দূর করতে।

৩.৩ বিবাহবিচ্ছেদ ও সামাজিক অস্থিরতা

কুরআন এবং সুন্নাহ মানুষের পারিবারিক জীবনকে সুশৃঙ্খল, মর্যাদাপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান দিয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম সংযম, পারস্পরিক সমঝোতা এবং ক্ষমার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে। যখন একটি সমাজে বা পরিবারে কুরআন নির্দেশিত এই বিধানগুলোর অভাব ঘটে বা এগুলোকে উপেক্ষা করা হয়, তখন বিবাহবিচ্ছেদ জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং এর প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে চরম সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়।

ইসলামে বিয়ে হচ্ছে একটি পবিত্র বন্ধন। একজন নারী ও একজন পুরুষের মাঝে সম্পাদিত সবচেয়ে জীবনঘনিষ্ঠ একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। কিন্তু কুরআনি নীতিমালার অনুপস্থিতিতে এই বন্ধন সহজেই ভেঙে যায়। কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله فيه خَيْرًا كَثِيرًا

‘হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।’ সূরা আন নিসা- (৪:১৯)

কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করতে এবং তাদের কোনো বিষয় অপছন্দ হলে ধৈর্যের পরিচয় দিতে, কারণ আল্লাহ হয়তো তাতেই কল্যাণ রেখেছেন। বর্তমান সমাজে এই বিধানের চর্চা না থাকায় সামান্য মতবিরোধ বা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কেন্দ্র করে অহংকারবশত বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দাম্পত্য জীবনে বড় কোন বিরোধ দেখা দিলে কুরআন নির্দেশিত পন্থায় সালিশ নিয়োগের মাধ্যমে ফয়সালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে এই সালিশি পদ্ধতি ভেঙে পড়েছে। মানুষ অহংকারবশত নিজেরা বা আদালতের মাধ্যমে বিচ্ছেদের পথ বেছে নেয়, যার ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের হার বেড়ে যাচ্ছে।

কুরআন নির্দেশিত তাকওয়া বা আল্লাহ তাআলার ভয় না থাকায় স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের অধিকার খর্ব করছে। যৌতুক, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের পেছনে রয়েছে কুরআনিক জবাবদিহিতার চেতনাকে ভুলে যাওয়া। নির্যাতন যখন সীমাহীন ও অসহনীয় হয় তখন বিবাহ বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে যায়।

কুরআনে তালাকের একটি সুনির্দিষ্ট, ধীরস্থির এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে, যেখানে রাগের মাথায় একবারে তিন তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু শরীআতের এই বিধান না জানার কারণে বা অবজ্ঞা করার কারণে অনেকে আবেগের বশে ছুট করে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে, যা পরে অনুশোচনা আনলেও আইনি বা সামাজিকভাবে সম্পর্ক জোড়া লাগানো কঠিন হয়ে পড়ে।

এছাড়াও মিথ্যা বলা, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, প্রতারণা কর, কর্তৃত্বের জন্য লড়াই করা। একে অপরকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা কিংবা হাস্যরসের নামে অপরকে অসম্মান করা। রসিকতার উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত অন্যকে সঙ্গে নিয়ে হাসা অন্যের প্রতি হাসাহাসি করা নয়। অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক হওয়া এবং সঙ্গীকে পাত্তা না দেওয়া। সততা ও বিশ্বস্ততার অভাব ইত্যাদি কারণে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়।

বিবাহ বিচ্ছেদ কেবল দুটি মানুষের বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং এটি একটি সামাজিক বিপর্যয়। ইসলামে বৈধ কাজের মধ্যে নিকুষ্ঠ কাজ হলো— তালাক। রাসূল ﷺ বলেছেন:

‘আল্লাহর কাছে বৈধ কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকুষ্ঠ হলো তালাক।’ (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

অর্থাৎ, তালাক ইসলাম অনুযায়ী বৈধ হলেও এটি আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। কারণ বিবাহ হলো একটি পবিত্র চুক্তি, যা ভেঙে দিলে পরিবার, সমাজ ও সন্তানদের উপর গভীর প্রভাব পড়ে।

কুরআনিক বিধানের অভাবে যখন বিবাহবিচ্ছেদ মহামারী আকার ধারণ করে, তখন সমাজে বহুমুখী অস্থিরতা দেখা দেয়—

১. পরিবার কাঠামো ভাঙ্গন ও মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়;
২. অপরাধ প্রবণতা ও কিশোর গ্যাং এর উত্থান ;
৩. নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা ;
৪. পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সামাজিক সম্পর্কে শিথিলতা ;
৫. বংশীয় শত্রুতা ও অস্থিরতা ,ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

দাম্পত্য জীবনকে সুখী করার দায়িত্ব চুক্তির উভয়পক্ষের অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী দুজনের উপর বর্তায়। তাই এই দায়িত্ব সম্পর্কে উভয়েরই জানা প্রয়োজন।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের কাছে তোমাদের চেয়েও উত্তম।’ (সুনান আত-তিরমিযী)

এই হাদিসে রাসূল ﷺ স্বামীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন নিজ স্ত্রীর কাছে ভালো হওয়ার।

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘আমি যদি মানুষ হিসেবে অন্য কোনো মানুষকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে নারীদের নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করতে; কারণ আল্লাহ তাআলা স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের বিশেষ অধিকার বা হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন।’

এই হাদিস দুটো স্বামী ও স্ত্রীর একে অপরের উপর বিশেষ হকের ব্যাপারে নির্দেশ করে। অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের সুখী হওয়ার জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে একে অপরকে গুরুত্ব দিতে হবে। হৃদয়তা-ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও পারস্পরিক সহমর্মিতা দিয়ে জান্নাতি সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখতে হবে।

বিবাহবিচ্ছেদ এবং সামাজিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে পারিবারিক জীবনে কুরআনের বিধান, যেমন—পারস্পরিক শ্রদ্ধা, পরমতসহিষ্ণুতা, ক্ষমা এবং সঠিক পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির চর্চা ফিরিয়ে আনা জরুরি। কুরআন নির্দেশিত এই পারিবারিক কাঠামো কেবল একটি ঘরকেই রক্ষা করে না, বরং পুরো সমাজকে বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত রাখে।

৩.৪ বিচারহীনতা ও দুর্নীতির প্রসার

একটি সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, ন্যায় বিচারের অভাব, দুর্নীতি প্রসারের অন্যতম প্রধান কারণ হলো—কুরআনিক শিক্ষার অভাব। কুরআন মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতির মূল উৎপাতনের নির্দেশ দেয়। কিন্তু মানুষ যখন কুরআনিক নীতিমালা থেকে বিমুখ থাকে তখন সমাজে বিচারহীনতা ও দুর্নীতির প্রসার জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়।

কুরআনের মূল শিক্ষা হলো মানুষ তার প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালার সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য। যখন সমাজ থেকে এই চেতনা হারিয়ে যায়, তখন মানুষের মধ্যে 'ধরাছোঁয়ার বাইরে' থাকার প্রবণতা তৈরি হয়। মানুষ আখেরাতে বিমুখ হয়ে যায়। পরকালের শাস্তির ভয় না থাকায় মানুষ অবলীলায় দুর্নীতি ও অন্যায়ে লিপ্ত হয়। কুরআন নির্দেশ দেয় যেন বিচারকার্য পরিচালনার সময় শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়। যদিও ন্যায়বিচার নিজের, পিতা-মাতার, নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারের জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতা বা আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।' সূরা আন নিসা (৪:১৩৫)

এই শিক্ষার অভাবে বর্তমানে বিচার ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের পক্ষে এবং দুর্বলদের বিপক্ষে চলে যায়, যা বিচারহীনতার সংস্কৃতি সৃষ্টি করে। এভাবেই যখন বিচারহীনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সমাজে দুর্নীতি মাথা চারা দিয়ে বসে। সমাজের শান্তি শৃংখলায় বিঘ্ন ঘটায়।

কুরআন মাজিদে সুদ, ঘুষ এবং অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআনিক জ্ঞানের অভাবে মানুষ কেবল বস্তুগত উন্নতিকে জীবনের সার্থকতা মনে করে। ফলে সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে তারা বৈধ ও অবৈধের পার্থক্য ভুলে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে —

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

'তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের সম্পদ গ্রাস করার জন্য বিচারকদের ঘুষ দিও না, অথচ তোমরা জানো।' সূরা বাকারাহ (২:১৮৮)
হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেন,

'হারাম দ্বারা বর্ধিত দেহ জাম্বাতে প্রবেশ করবে না।' (মেশকাত)

অর্থাৎ অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করা, সুদ-ঘুষ দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি করা, অন্যের হক নষ্ট করা —এভাবে বর্তমানে তাকওয়াহীন সম্পদশালীদের সম্পদ ফুলে-ফেপে উঠছে। আর হারাম সম্পদ দ্বারা যে দেহ বর্ধিত হবে তা জাম্বাতের প্রবেশ করবে না।

তাই, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ সকল ক্ষেত্রেই কুরআনিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। কুরআনিক শিক্ষা মানুষের হৃদয়ে নৈতিকতার ভিত্তি তৈরি করে। এই শিক্ষার প্রসার ঘটলে মানুষের মধ্যে সততা, আমানতদারিতা এবং দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা একটি দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়বিচারসম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণে অপরিহার্য।

অধ্যায়-৪ আধুনিক বিশ্বের সংকট ও কুরআন

আধুনিক বিশ্ব বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং বস্তুগত দিক থেকে অভূতপূর্ব উন্নতি করলেও, মানবজাতি আজ গভীর আত্মিক, সামাজিক ও বৈশ্বিক সংকটের মুখোমুখি। নৈতিক অবক্ষয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পরিবেশ বিপর্যয়, মানসিক অশান্তি এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য আজকের পৃথিবীকে এক অশান্ত গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে।

কুরআন কেবল একটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গ্রন্থ নয়, বরং এটি মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ এক শাস্ত্রত পথনির্দেশিকা।

আধুনিক সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও বস্তুবাদের আতিশয্যে পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে এবং নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটছে। ফলে সামাজ্য ব্যবস্থা বিশৃংখল হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক সংগতি নষ্ট হচ্ছে ও মানব কল্যাণমূলক কার্যক্রম বিঘ্ন ঘটছে। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বড় সংকট হলো ধনিক ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যকার আকাশচুম্বী ব্যবধান। পুঁজিবাদের অসম প্রতিযোগিতায় সম্পদ কিছু নির্দিষ্ট মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ছে। সুদযুক্ত অর্থনীতি ধনীকে আরো সম্পদশালী করছে এবং গরিবকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। ধনীর সম্পদে গরিবের হক যাকাত-সাদকাহ আদায়ে অনীহা ধনী ও দারিদ্র্যের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়েছে।

আধুনিক বিশ্ব উন্নত অস্ত্র ও প্রযুক্তির জোরে যুদ্ধ-বিগ্রহ, বর্ণবাদ এবং আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। মানুষের তৈরি কৃত্রিম বিভেদ ও জাতিগত অহংকার বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করছে। ভৌগলিক সীমারেখা টেনে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে। আর কুরআন মানবজাতির সমতা ঘোষণা করে বর্ণবাদ ও বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার গুঁড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু বর্তমানে মানুষ কুরআনিক বিধি-নিষেধ না মেনে বিশ্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

কুরআন মানুষকে পৃথিবীর "খলিফা" বা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বশীল আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু মানুষের সীমাহীন লোভ, প্রাকৃতিক সম্পদ অপচয়, স্বার্থের কারণে প্রকৃতির জন্য উপকারী প্রাণী হত্যা, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছে। মানুষের হাতের কামাইয়ের কারণেই জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে—এই সত্যও কুরআন শতবর্ষ আগে সতর্ক করেছে।

সমস্ত জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও আধুনিক মানুষের মধ্যে বিষণ্ণতা, মানসিক চাপ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। বস্তুগত উন্নতি মানুষের আত্মার খোরাক জোগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এদিকে কুরআন মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষের প্রকৃত শান্তি ও স্থিতি কেবল স্রষ্টার স্মরণের মাধ্যমেই সম্ভব।

আধুনিক বিশ্বের সংকটগুলো বাহ্যিক মনে হলেও এর মূল উৎস মানুষের অভ্যন্তরীণ, নৈতিক ও আত্মিক শূন্যতা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে যদি কুরআনের অবিনশ্বর হেদায়েত, ইনসাফ ও নৈতিকতার ফ্রেমে বাঁধা না যায়, তবে এই সংকট থেকে মুক্তি অসম্ভব। কুরআন মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ দেখায়; তাই আধুনিক বিশ্বের সামগ্রিক মুক্তির একমাত্র উপায় হলো কুরআনের শাস্ত্রত আদর্শের দিকে ফিরে আসা।

৪.১ অর্থনৈতিক বৈষম্য: সুদি ব্যবস্থার প্রসার ও যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির অনুপস্থিতি

একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পেছনে অর্থ ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান বৈশ্বিক ও দেশীয় প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম রূপ ধারণ করার পেছনে দুটি প্রধান নিয়ামক কাজ করেছে: সুদি ব্যবস্থার অনিয়ন্ত্রিত প্রসার এবং ইসলামী সমাজকল্যাণমূলক 'যাকাত' ব্যবস্থার কার্যকর অনুপস্থিতি।

আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম মূল ভিত্তি হলো সুদ। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে ব্যবসার একটি মাধ্যম মনে হলেও, সামষ্টিক অর্থনীতিতে এটি তীব্র বৈষম্য তৈরি করে। সুদি ব্যবস্থায় পুঁজির মালিকরা কোন শ্রম বা ঝুঁকি না নিয়েই কেবল টাকা ধার দিয়ে আরো টাকার মালিক হয়। অপরদিকে ঋণগ্রহীতা টাকা ধার নিয়ে লাভ করুক বা লোকসান, একটি নির্দিষ্ট সময় পর, তাকে নির্দিষ্ট হারে সুদ সহ টাকা ফেরত দিতে হয়। ফলে সমাজে সম্পদ গুটিকয়েক মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত থাকে। অন্যদিকে কুরআন যে কোন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি সুদ গ্রহণ, প্রদান ও সুদি কারবারের মাধ্যমে উপার্জন সম্পূর্ণ হারাম করেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

‘যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতের দিনে দাঁড়াবে ঠিক সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান ছুঁয়ে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এটা এজন্য যে তারা বলে, ‘ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই।’ অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।’
সূরা আল-বাকারাহ (২ : ২৭৫)

সুদের হার নিশ্চিত থাকায় অনেকেই ঝুঁকিপূর্ণ কর্মসংস্থান তৈরিকারী শিল্প খাতে বিনিয়োগ না করে ব্যাংকে টাকা জমিয়ে রেখে সুদ খাওয়াকে নিরাপদ মনে করেন। এতে বাজারে কৃত্রিম টাকার সরবরাহ বাড়লেও প্রকৃত উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ে না। তাছাড়া ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অর্থ সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখা নিষিদ্ধ। যার অর্থ সম্পদ আছে সেই সম্পদ তাকে অবশ্যই বিনিয়োগ করতে হবে, প্রয়োজনীয় ব্যয় করতে হবে, যাকাত দিতে হবে, দান করতে হবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে —

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۖ

‘দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে গীবতকারী। যে সম্পদ জমা করে এবং বার বার গণনা করে। সে মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরজীবী করবে।’ সূরা হুমাযাহ (১০৪:২-৩)

ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন। এই সুদের খরচ তারা পণ্যের দাম বাড়িয়ে সাধারণ ভোক্তার পকেট থেকে উসূল করেন। ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে।

ইসলামিক অর্থব্যবস্থায় যাকাত অপরিহার্য। নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদ যারই থাকবে তাকে অবশ্যই ২.৫% হারে অর্থ নিজের সম্পদ থেকে বের করে দিতে হবে। এর অর্থ পাবে অভাবি ও বিপদগ্রস্থ লোকেরা। এটি কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং একটি সুনিপুণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক হাতিয়ার। সমাজে এর অনুপস্থিতি বৈষম্যকে আরও বেগবান করেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۚ

‘আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।’ সূরা বাকারাহ (২:৪৩)

কুরআনে বহু জায়গায় যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যখনই সালাতের কথা আসছে তখনই আল্লাহ তাআলা সালাতের পরে যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে যাকাতের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

একটি আদর্শ যাকাতভিত্তিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্র বা সমাজ দরিদ্র, এতিম, বিধবা ও ঋণগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেয়। এটি অনুৎপাদনশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলে। যাকাত না থাকায় রাষ্ট্রকে কেবল করের ওপর নির্ভর করতে হয়, যা অনেক সময় সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকলে দরিদ্র মানুষের হাতে নগদ অর্থ পৌঁছায়, যা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করে এবং বাজারে পণ্যের চাহিদা বাড়ায়। যাকাত না থাকায় দরিদ্রদের ক্রয়ক্ষমতা দিন দিন কমছে, যা সামগ্রিক অর্থনীতিকে স্থবির করে দেয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের এই ক্ষত নিরাময় করতে হলে কেবল প্রবৃদ্ধি বা জিডিপি বাড়ালেই চলবে না, বরং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। সুদি ব্যবস্থার শোষণমূলক চরিত্র দূর করে যদি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও আধুনিক যাকাতভিত্তিক কর এবং কল্যাণ তহবিল গঠন করা যায়, তবেই সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার এই আকাশচুম্বী ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব।

৪.২ লিঙ্গ বৈষম্য ও নারী অধিকার: কুরআনিক অধিকার বনাম আধুনিক শোষণ

ইসলামে নারীর অধিকার এবং আধুনিক বিশ্বে নারীর অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। একদিকে পবিত্র কুরআন নারীকে সম্মান ও অধিকার দিয়েছে, অন্যদিকে আধুনিক ভোগবাদী সমাজ বা সংস্কৃতি নারীর অধিকারকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত বা অপব্যবহার করেছে।

আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে, যখন বিশ্বে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো এবং নারীকে ভাবা হতো কেবলই ভোগ্যপণ্য, তখন পবিত্র কুরআন নারীর অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। কুরআন স্পষ্ট করেছে যে, সৃষ্টিগত ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে নারী ও পুরুষ সমান। নিজ নিজ অবস্থা ও উপযোগিতা অনুসারে দুনিয়ার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দীগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান

অংশীদার। আর কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণ প্রায় সকল দ্বীনি বিষয়ে নারী-পুরুষ ও উভয়েই সমান। তাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। যেমন তাওহীদ, আকিদা-বিশ্বাস, আল্লাহ তায়ালার প্রতি সমর্পণ, কৃতকর্মের প্রতিদান—পুরস্কার কিংবা শাস্তি, সওয়াব ও ফাযায়েল ইত্যাদি। তেমনিভাবে শরীয়তের সাধারণ দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
نَفِيرًا

‘আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে যে নেককাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে মুমিন, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুর বীচির আবরণ পরিমাণ যুলমও করা হবে না।’ সূরা আন-নিসা (৪:১২৪)

ভালো কাজের প্রতিদান এবং আল্লাহর কাছে মর্যাদার ক্ষেত্রে কোনো লিঙ্গভেদ নেই।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ
‘অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন পুরুষ অথবা মহিলা আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। তোমাদের একে অপরের অংশ।’ সূরা আল ইমরান (৩:১৯৫)

তবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য দৈহিক ও মানসিক গঠন ইত্যাদি দিক থেকে আল্লাহ তায়ালার নারী ও পুরুষের মাঝে কিছু পার্থক্য রেখেছেন। পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন পূর্ণ শক্তি দিয়ে। নারীর সকল দায়িত্ব পালন, তার নিরাপত্তা বিধান, ভরণপোষণ ও বংশের সংরক্ষণ ও প্রতিফলন পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহতালা এরশাদ করেন —

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

‘পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযত করেছেন।’ সূরা আন-নিসা (৪:৩৪)

সংসারে খরচের দায়িত্ব যে পুরুষের উপর এটা আল্লাহ তাআলা একাধিকবার বুঝিয়েছেন। পুরুষের এই দায়িত্ব ও কর্তব্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল ﷺ এর নিকট সৃষ্টির প্রতি পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—

‘যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে যখন তুমি বস্ত্র পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাবে...।’ সুনানে আবু দাউদ-২১৪২

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদিস সমূহ দ্বারা বোঝা যায় যে, নারীর সকল গুরুভার পুরুষের কাঁধে। পুরুষের দায়িত্ব হল নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। আর এসবের যোগান দেওয়ার জন্য প্রয়োজন জীবিকা উপার্জনের।

অন্যদিক, পাশ্চাত্যে বিংশ শতাব্দীর আগেও বিবাহিত নারীর নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার ছিল না। অথচ কুরআন ১৪০০ বছর আগেই নারীকে উপার্জনের এবং নিজস্ব সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিকানার অধিকার দিয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ

‘পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে।’ সূরা আন-নিসা (৪:৩২)

বিয়ের সময় কনেকে সরাসরি ‘মোহর’ দিতে হয়, যা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব সম্পদ। পিতা, স্বামী, সন্তান ও ভাইয়ের সম্পত্তিতে নারীর নির্দিষ্ট অংশ কুরআন দ্বারা নির্ধারিত আছে। এছাড়াও বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর রয়েছে মত প্রকাশের অধিকার। নারীর নিজস্ব সম্পদ থাকুক বা না থাকুক, তার যাবতীয় ভরণপোষণের (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা) দায়িত্ব সম্পূর্ণ পুরুষ (পিতা, ভাই বা স্বামী)-এর ওপর ন্যস্ত। বৈবাহিক জীবন যাপনে ব্যর্থ হলে নারীর বিবাহবিচ্ছেদের (খোলা) অধিকার এবং পরবর্তীতে সম্মানজনক পুনর্বিবাহের অধিকার কুরআন নিশ্চিত করেছে।

নারীকে আল্লাহ বানিয়েছেন দুনিয়ার জান্নাত। তিনি স্বামীর জন্য প্রশান্তি, সন্তানের জন্য আশ্রয়, পুরো পরিবারের খুঁটি হলেন একজন নারী। ইসলাম নারীকে তো পুরুষের সামান্য অধিকার দিয়েছেনই, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণসহ বিভিন্ন সময়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের প্রতি দয়া, সম্মান এবং সমতা নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন।

বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহর রাসূল ﷺ বিশেষভাবে স্ত্রীদের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন—

‘তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ।’ (সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১২১৮)

আজ বিশ্বব্যাপী নারী স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির নামে নারীর নারীত্বকে বিনষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। অপরিণামদর্শী কিছু মানুষ নারীকে ভোগের উপকরণ ও ব্যবসায়ী পন্য রূপে উপস্থাপন করেছে। গৃহকর্মী, স্বামীর জীবনসঙ্গিনী, সন্তানের জননী হিসাবে বর্তমান সমাজে নারীর কোনই মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না। একমাত্র ইসলামই সার্বিকভাবে নারীকে তার স্বভাবজাত অবস্থান থেকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষকে স্ব স্ব অবস্থানে রেখেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের উৎসাহিত করা হয়। এজন্য তাদের আলাদা আলাদা কর্মস্থলের ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। ইসলামে নারী পুরুষ উভয়ই মানুষ হিসাবে সমান মর্যাদার অধিকারী। কেউ পুরুষত্বের কারণে সম্মান লাভ করবে আর কেউ নারীত্বের কারণে লাঞ্ছনা ভোগ করবে—এরূপ আচরণ ইসলামের পরিত্যাজ্য।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া লাগা শুরু করেছে। ফলে অনেক নারী ঘর সংসার ছেড়ে ক্যারিয়ার গঠনে মনোযোগী হচ্ছে। এমনকি নিজের দুধের শিশুকেও কাজের মেয়ের কাছে রেখে সারাদিন ক্যারিয়ার গঠনেই ডুবে থাকছে। কোথায় স্বামী, কোথায় সন্তান আর কোথায় একজন নারী প্রিয় স্থান তার সংসার! সবই যেন আজ অফিসের টেবিলে, চায়ের কাপে, বন্ধুদের সাথে আড্ডায় হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে বছর কয়েকের পর স্বামীকে আর ভালো লাগেনা। অফিসের কোন কলিগকে ততদিনে মনে ধরে গিয়েছে। তাই স্বামী সংসার ছেড়ে, নিজের সন্তানকেও ছেড়ে, সেই কলিগের সাথে চলে যাওয়ার মতো ঘটনাও এখন কম না।

ক্যারিয়ার গঠনের লোভনীয় অফারে নারীরা বেপর্দা হয়ে যাচ্ছে। নিজের দীন, ঈমানকে খুইয়ে ফেলছে। নিজের প্রিয় স্বামী সন্তান আর সংসার হারিয়ে দুনিয়াও হারাচ্ছে। আর আখিরাত তো সেই কবেই হারিয়ে বসে আছে।

মুক্ত হতে গিয়ে, স্বাধীন হতে গিয়ে, স্বাবলম্বী হতে গিয়ে, সে প্রধান শত্রু হিসেবে চিনে নিয়েছে নিজের পরিবারকে ও ধর্মকে। পর্দার ফরজ বিধানকে ছুড়ে ফেলেছে। গরম লাগে, দমবন্ধ লাগে, বুড়ি বুড়ি লাগে। ধর্মকে সেকেলে, নারী বিদ্রোহী, পুরুষের জুলুমের হাতিয়ার মনে করছে।

গত চৌদ্দশ বছরের আলিমসমাজকে, সাহাবীদেরকে, এমনকি খোদ নবীজি ﷺ কেও পুরুষতান্ত্রিক সেক্সিষ্ট বলতে ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত কোনভাবেই নারীবাদের প্যারাডাইমে

ইসলামকে কুলিয়ে উঠতে পারেনি, ছেড়ে দিয়েছে ঈমানকেই। নারীবাদের শেষ গিয়ে
ঠেকে কুফরে। পশ্চিমের সুরে সুর মিলিয়ে নারীরা নিজ পরিবার ও ধর্মকে কথায় কথায়
সেক্সিস্ট, পুরুষতান্ত্রিক, নারীবিরোধী, কুসংস্কার বলে গালি দিচ্ছে।

হাজারো মানুষের হাজারো মনমানস থেকে সুরক্ষার সকল স্তর নারী ত্যাগ করেছে।
ইসলাম যে কয়েক স্তর বিশিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নারীর জন্য দিয়েছিল, সেগুলোকে
উঠিয়ে দিয়ে নারীকে ভিকটিম হিসেবে শিকারযোগ্য করে তুলেছে নারী নিজেই। পশ্চিমা
সভ্যতার বড়ি গিলে তুলে নিয়েছে সব বাঁধ। সহশিক্ষা, সহকর্ম, বিয়েপূর্ব প্রেম, পরকীয়া।
যে নারীকে পাওয়া ছিল কঠিন, নারীকে পেতে হলে পুরো সমাজকে সাক্ষী রেখে,
উপযুক্ত সম্মানী পরিশোধ করে, স্বামী হিসেবে তার আজীবন সকল প্রয়োজন পূরণের
দায়িত্ব নিয়ে এরপর তাকে একান্ত পেতে হতো। এখন সে নারীকে সহজেই পাওয়া
যায় চোখের আড়ালে, কোন প্রমাণ থাকে না, নিয়ে যাওয়া যায় পার্কের চিপায়,
লাইব্রেরীতে স্টাডির অসিলায়, খালি ফ্ল্যাটে, হোটেলে, অফিসে কিংবা মিডিয়া সুযোগ
দেবার লোভ দেখিয়ে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, বিয়ের প্রলোভন
দেখিয়ে ভোগ, গর্ভপাত, ড্রেনে পড়ে থাকা নবজাতক, ভিডিও তুলে ছেড়ে দেওয়া।

কুরআনের উদ্দেশ্য ছিল নারীকে তার আপন সন্তায়, তার স্বকীয়তা ও হিজাবের সুরক্ষায়
রেখে সর্বোচ্চ সম্মান ও অধিকার দেওয়া। অন্যদিকে, আধুনিক শোষণ নারীকে পুরুষের
সমকক্ষ করার প্রতিযোগিতায় নামিয়ে তার ওপর অতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক বোঝা
চাপিয়ে দিয়েছে। প্রকৃত নারী অধিকার তখনই নিশ্চিত সম্ভব, যখন জৈবিক ও
মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যকে স্বীকার করে নারীকে সস্তা স্লেগানের মোড়কে বন্দি না করে তার
মানবিক মর্যাদা এবং কুরআনিক অধিকারগুলো সঠিকভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

৪.৩ অপরাধপ্রবণতা ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা

বর্তমান বিশ্বে অপরাধপ্রবণতা ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার প্রধান ও অন্যতম কারণ হলো কুরআনিক শাস্ত্রত বিধান থেকে দূরে সরে যাওয়া। কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়ার সরাসরি প্রভাব পড়ে মানুষের মনস্তত্ত্ব, নৈতিকতা এবং সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার ওপর। যখন একটি সমাজ বা জাতি কুরআনের দিকনির্দেশনা ও নৈতিক মূল্যবোধ পরিহার করে, তখন সেখানে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা চরম আকার ধারণ করে।

কুরআন মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং অপরাধ থেকে দূরে রাখে। কুরআনের মূল শিক্ষা হলো 'তাকওয়া' বা আল্লাহর প্রতি ভয় এবং পরকালের জবাবদিহিতা। মানুষ যখন কুরআন থেকে দূরে সরে যায়, তখন সে মনে করে দুনিয়ার আইনের চোখ ফাঁকি দিতে পারলেই সে মুক্ত। পরকালীন শাস্তির ভয় না থাকায় মানুষ গোপনে বা প্রকাশ্যে যেকোনো বড় অপরাধ (যেমন: খুন, ধর্ষণ, চুরি, দুর্নীতি) করতে দ্বিধাবোধ করে না।

কুরআন মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তার মর্যাদা ধরে রাখার শিক্ষা দেয়। কুরআন থেকে বিমুখ হলে মানুষের ভেতরের পাশবিক প্রবৃত্তি বা কুপ্রবৃত্তি (নফসে আম্মারা) জাগ্রত হয়। ফলে সমাজ, সংস্কৃতি ও বিনোদনের নামে অশ্লীলতা ও মাদকাসক্তি ছড়িয়ে পড়ে, যা সব ধরনের অপরাধের মূল চাবিকাঠি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

‘নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।’ সূরা আনকাবূত (২৯:৪৫)

কুরআনের নির্দেশ থেকে দূরে থাকার ফলে মানুষের মধ্যে সালাতের ব্যাপারে অনিহা সৃষ্টি হয়েছে। সালাত থেকে দূরে থাকার কারণে শয়তান ব্যক্তি ও সমাজকে স্বাভাবিকভাবেই অশ্লীলতার দিকে ঠেলে দেয়।

কুরআন সুদ, ঘুষ, অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে আত্মসাত করা কঠোর ভাবে হারাম করেছে। বর্তমানে মানুষের মধ্যে রাতা-রাতি ধনী হওয়ার অন্ধ লোভে মানুষ হারাম পণ্যের ব্যবসা, প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন, জুয়া, লটারি, বাজি ইত্যাদি হারাম কাজে জড়িয়ে পড়েছে।

অপরাধপ্রবণতা যখন জ্যামিতিক হারে বাড়ে, তখন সমাজের প্রতিটি স্তরে নিরাপত্তাহীনতা জেঁকে বসে। কুরআন নারী, শিশু, এতিম ও সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুরক্ষা ও অধিকার দিয়েছে। সমাজ যখন কুরআনের এই সুরক্ষাকবচ থেকে দূরে সরে যায়,

তখন নারীরা ইভটিজিং, ধর্ষণ ও পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়। এতিমদের সম্পদ লুট হয়ে যায় এবং সমাজে ‘জোর যার মুল্লুক তার’ নীতি প্রতিষ্ঠা পায়।

ন্যায়বিচার থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে সমাজে আইনের শাসন ভেঙে পড়ে। প্রভাবশালীরা পার পেয়ে যায় আর দুর্বলরা বিচার পায় না, যা সাধারণ মানুষের মনে তীব্র সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও ক্ষোভের জন্ম দেয়।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন —

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى

‘আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়।’ সূরা ত্বহা (২০:১২৪) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর স্মরণ বা কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে মানবজীবনের পরিণতি কী হবে—

১. কুরআন ও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতা;
২. জীবন সংকীর্ণ ও অশান্তিময় হওয়া (অর্থনৈতিক ও মানসিক সংকট);
৩. শয়তানের প্রভাব বৃদ্ধি (অপরাধপ্রবণতা);
৪. সামাজিক বিপর্যয় ও পরকালীন অন্ধত্ব ;

মানুষ যখন কুরআন থেকে দূরে সরে যায়, তখন তার মন থেকে পরকালের জবাবদিহিতার অনুভূতি হারিয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় আইন বা পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব, এই চিন্তা থেকে মানুষ খুব সহজেই চুরি, ডাকাতি, খুন বা ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না।

একটি সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা সিসিটিভি ক্যামেরা, পুলিশ বা কঠোর আইন দিয়ে স্থায়ীভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, যদি না মানুষের অন্তরে নৈতিক পরিবর্তন আসে। কুরআন মানুষের ভেতরে সেই নৈতিক পাহারাদার তৈরি করে। সুতরাং, অপরাধমুক্ত ও নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণে কেবল আনুষ্ঠানিক পঠন নয়, বরং কুরআনের অর্থ অনুধাবন করা এবং পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এর আইন ও সামাজিক নীতিমালার বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য।

অধ্যায়-৫ মুসলিম বিশ্বের বর্তমান চিত্র

কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে আদর্শিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্তরে এক বড় ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়েছে। একদিকে যেমন ইসলামী মূল্যবোধের অভাব দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ, অভ্যন্তরীণ কলহ-বিরোধ এবং বিদেশী আগ্রাসনের শিকার হয়ে কোটি কোটি মুসলিম আজ চরম সংকটে জীবনযাপন করছেন।

শরীয়াহ আইনের কার্যকারিতা ও প্রয়োগের ধরণ অনুসারে মুসলিম দেশ গুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক শরীয়াহ আইনের দাবিদার দেশসমূহ, মিশ্র আইন ব্যবস্থার দেশসমূহ ও ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম দেশসমূহ। নিম্নে কয়েকটি মুসলিম দেশে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

সৌদি আরব: শরীয়াহ আইনের কার্যকারিতা ও প্রয়োগের ধরণ অনুসারে সৌদি আরব হলো আংশিক শরীয়াহ আইন প্রয়োগকারী মুসলিম দেশ। ঐতিহাসিকভাবে দেশের বিচারব্যবস্থা শরীয়াহর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে (ভিশন ২০৩০-এর অধীনে) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যা অনেক ইসলামিক স্কলারের মতে কুরআনিক সমাজ ব্যবস্থার মূল চেতনা থেকে বিচ্যুতি।

ইসলামের শুরু থেকেই সৌদি আরবে সিনেমা হল, কনসার্ট এবং নারী-পুরুষের উন্মুক্ত মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় 'জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটি' (GEA)-এর অধীনে রিয়াদ সিজনসহ দেশজুড়ে বিশাল পশ্চিমা মিউজিক কনসার্ট, থিয়েটার এবং সিনেমা হলের আয়োজন করা হচ্ছে। বিশ্বখ্যাত পপ ও রক তারকাদের এনে নাচ-গানের অনুষ্ঠান করা হচ্ছে, যেখানে তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশা লক্ষ্য করা যায়। অনেক ইসলামিক স্কলারের মতে, এটি পবিত্র ভূমির নৈতিক পবিত্রতা এবং কুরআনিক শালীনতার শিক্ষার পরিপন্থী। নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং পুরুষ অভিভাবকের (মাহরাম) অনুমতি ছাড়াই বিদেশে ভ্রমণ, ব্যবসা বা চাকরি করার আইনি অধিকার দেওয়া হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বহুগুণ বেড়েছে। তবে এর পাশাপাশি পশ্চিমা ধাঁচের নারী স্বাধীনতার ছোঁয়া আসায় পারিবারিক ঐতিহ্যে এক ধরনের ফাটল ধরছে বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন। 'হায়আহ' বা 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' (সৎ কাজের

আদেশ ও অসং কাজের নিষেধকারী কমিটি)–যা সৌদি সমাজের নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসন বজায় রাখত, তাদের গ্রেফতারি ও শাস্তিমূলক ক্ষমতা সম্পূর্ণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে জনসমক্ষে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ বা শালীনতা বজায় রাখার রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা আর নেই।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সৌদি আরব ঐতিহ্যগত রাজতন্ত্র থেকে আরও বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সকল চাবিকাঠি (প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা) নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছেন। দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের নামে রাজপরিবারের অন্যান্য প্রভাবশালী সদস্য এবং ব্যবসায়ী এলিটদের কোণঠাসা করা হয়েছে। অতীতে সৌদি আরবে ‘আল-শেখ’ পরিবার এবং বড় বড় ওলামায়ে কেরামদের রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে বিশাল প্রভাব ছিল। বর্তমান সরকার সেই ধর্মীয় প্রভাবকে প্রায় শূন্যে নামিয়ে এনেছে। সালমান আল-আওদাহ, আলী আল-ওমারির মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু স্বাধীনচেতা ইসলামিক স্কলার, চিন্তাবিদ এবং গবেষকদের কারাগারে বন্দি করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ফতোয়া বোর্ডকে কেবল সরকারের নীতিকে বৈধতা দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইয়েমেনে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, কাতারের ওপর অবরোধ (যা পরে তুলে নেওয়া হয়েছে) এবং ইরানের সাথে সাম্প্রতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক জোড়া লাগানোর মাধ্যমে সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যে নিজের আধিপত্য ধরে রাখার চেষ্টা করছে। তবে ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসরায়েলের প্রতি তাদের নরম মনোভাব এবং পশ্চিমা বিশ্বের সাথে ঘনিষ্ঠতা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনার (মুসলিমরা পরস্পর ভাই ভাই) সাথে সাংঘর্ষিক বলে সমালোচিত।

সৌদি অর্থনীতি এখন আর কেবল তেলের ওপর ভরসা করে বসে থাকতে চাচ্ছে না। তারা তাদের পুরো অর্থনৈতিক মডেল বদলে ফেলছে। ভিশন ২০৩০-এর মূল লক্ষ্য হলো খনিজ তেলের ওপর থেকে দেশের অর্থনীতিকে মুক্ত করা। এজন্য তারা পর্যটন, বিনোদন, এবং বিদেশী বিনিয়োগের ওপর জোর দিচ্ছে। লোহিত সাগরের উপকূলে ৫০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে রোবোটিক ও হাই-টেক মেগা সিটি ‘নিওম’ (NEOM) এবং এর ভেতরের লিনিয়ার শহর ‘দ্যা লাইন’। এই শহরগুলোকে সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক খাঁচে গড়া হচ্ছে, যেখানে পশ্চিমা জীবনযাত্রা, এমনকি মদ বিক্রির আইনি বৈধতার মতো বিষয়গুলোও যুক্ত হচ্ছে, যা ইসলামের পবিত্র ভূমিতে শরীয়াহর মূল চেতনার অবক্ষয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। আধুনিক সৌদি অর্থনীতি এখন কর ব্যবস্থা

(VAT), আন্তর্জাতিক ঋণ এবং পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। যদিও তারা ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের কথা বলে, কিন্তু বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়ায় সুদী অর্থব্যবস্থার পরোক্ষ প্রভাব থেকে তারা মুক্ত নয়।

সৌদি আরবের এই বর্তমান চিত্রটি প্রমাণ করে যে, কেবল অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নই একটি সমাজের প্রকৃত কল্যাণ বা নৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করতে পারে না।

ইসলামের সূতিকাগার হওয়া সত্ত্বেও, কুরআনের মৌলিক, সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা (যেমন: হায়া, সৎ কাজের আদেশ-অসৎ কাজের নিষেধ, এবং ওলামাদের সম্মান) থেকে দূরে সরে গিয়ে যখন পশ্চিমা ভোগবাদী ও বিনোদনমূলক সংস্কৃতিকে আলিঙ্গন করা হয়, তখন বাহ্যিক চাকচিক্য বাড়লেও সমাজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এটিই কুরআনিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুতির সমসাময়িক সামাজিক ক্ষতির অন্যতম বড় প্রমাণ।

দুবাই: দুবাই আজ বিশ্বের বুকে এক আধুনিক রূপকথা। মরুভূমির একটি সাধারণ মৎস্যজীবী গ্রাম থেকে মাত্র কয়েক দশকে এটি বিশ্বের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক, পর্যটন ও প্রযুক্তির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তবে এই বাহ্যিক চাকচিক্য ও আকাশচুম্বী অট্টালিকার আড়ালে ইসলামিক মূল্যবোধের যে রূপান্তর ঘটেছে, তা নৈতিক বিবর্তনের এক চরম বাস্তব চিত্র।

সংবিধান অনুযায়ী দুবাই তথা সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম এবং আইনের উৎস শরীয়াহ। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এখানে ধর্মের ভূমিকা অনেকটাই আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুবাই তার দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। বর্তমানে অবিবাহিত যুগলদের একসাথে বসবাস (লিভ-ইন), সম্মতিসূচক শারীরিক সম্পর্ক এবং মদ্যপানকে সম্পূর্ণ আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এমনকি ব্যক্তিগত আইন বা পারিবারিক বিরোধের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের জন্য শরীয়াহ আইনের বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হয়েছে।

এখানে চমৎকার সব মেগা-মসজিদ (যেমন: শেখ জায়েদ গ্র্যান্ড মসজিদ) আছে, আজান হয়, আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতাও হয়। কিন্তু কুরআনের যে মূল দাবি—ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ‘তাকওয়া’ (আল্লাহভীতি) এবং ‘হায়া’ (শালীনতা) বজায় রাখা—তা করপোরেট ও বাণিজ্যিক স্বার্থের নিচে চাপা পড়ে গেছে। ধর্ম এখানে আধ্যাত্মিক

পথপ্রদর্শকের চেয়ে একটি ‘সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’ (Cultural Heritage) হিসেবে বেশি প্রদর্শিত হয়।

দুবাইয়ের সামাজিক কাঠামো পৃথিবীর যেকোনো শহরের চেয়ে আলাদা। এখানকার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫-৯০% মানুষই বিদেশী (প্রবাসী ও অভিবাসী)। বিশ্বের বড় বড় তারকা, ইনফ্লুয়েন্সার এবং ধনকুবেরদের প্রধান চারণভূমি দুবাই। সমুদ্র সৈকত, বিলাসবহুল নাইটক্লাব, ক্যাসিনো চালুর প্রস্তুতি এবং উন্মুক্ত পশ্চিমা লাইফস্টাইল দুবাইয়ের স্বাভাবিক চিত্রে পরিণত হয়েছে। কুরআনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো চোখের হেফাজত এবং শালীনতা। কিন্তু দুবাইয়ের সমাজ ব্যবস্থা এখন এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যেখানে ভোগবাদ (Consumerism) এবং স্থূল প্রদর্শনপ্রিয়তা (Luxury culture) প্রধান সামাজিক মূল্যবোধে পরিণত হয়েছে। যদিও আদিবাসী বা স্থানীয় আমিরাত সমাজ এখনও কিছুটা রক্ষণশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করে, তবে তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ এই তীব্র পশ্চিমা ভোগবাদী সংস্কৃতির জোয়ারে নিজেদের অজান্তেই গা ভাসিয়ে দিচ্ছে।

রাজনৈতিকভাবে দুবাই আল-মাকতুম রাজপরিবারের অধীনে একটি সুশাসিত ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক হাব। এখানে কোনো রাজনৈতিক দল, সংসদীয় নির্বাচন বা মতপ্রকাশের উন্মুক্ত স্বাধীনতা নেই। রাজপরিবারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সামাজিক বা অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে সরকার যা কিছু চাপিয়ে দেয়, জনগণ তা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের অংশ হিসেবে দুবাই ইসরায়েলের সাথে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। গাজা ও ফিলিস্তিনে যখন মুসলিমদের ওপর নৃশংসতা চলছে, তখন দুবাইয়ের সাথে ইসরায়েলের বাণিজ্য, পর্যটন এবং সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্বাভাবিক গতিতে চলছে। কুরআনের শিক্ষা হলো—মুসলিমরা একে অপরের ভাই এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক লাভ ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কাছে এই কুরআনিক ভ্রাতৃত্ববোধ আজ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

কুরআনে ‘কারুণ’-এর যে গল্প বলা হয়েছে, যা মূলত সম্পদের অহংকার এবং আধ্যাত্মিকতাহীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতীক, আধুনিক দুবাইয়ের অর্থনৈতিক মডেলকে অনেক চিন্তাবিদ তারই একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ মনে করেন। দুবাইয়ের অর্থনীতি তেল-নির্ভরতা থেকে বের হয়ে এখন সম্পূর্ণ পর্যটন, রিয়েল এস্টেট, এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের

ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বের সমস্ত বৈধ-অবৈধ এবং কর ফাঁকি দেওয়া টাকার এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল এই শহর।

একদিকে বিশ্বের সবচেয়ে বিলাসবহুল সাত-তারকা হোটেল (বুর্জ আল আরব), মিলিয়ন ডলারের গাড়ি এবং কৃত্রিম দ্বীপ (পাম জুমেইরাহ); অন্যদিকে সাউথ এশিয়ান (বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত) লাখ লাখ নির্মাণ শ্রমিকের সস্তা শ্রম ও তাদের মানবেতর জীবনযাপন।

কুরআনের মূল অর্থনৈতিক দর্শন হলো সম্পদের সুষম বণ্টন এবং শ্রমিকের অধিকার রক্ষা করা (“শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে তার মজুরি দিয়ে দাও”)। কিন্তু দুবাইয়ের পুঁজিবাদী মডেলে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে এই মানবিক ও কুরআনিক ইনসাফ চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়ার সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রের 'অফিসিয়াল ধর্ম' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি রাজ্যে সুলতানদের অধীনে শক্তিশালী শরীয়াহ কাউন্সিল কাজ করে। কিন্তু কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখানে বড় ধরনের শূন্যতা রয়েছে।

মালয়েশিয়ায় দুই ধরনের আইন সমান্তরালে চলে—ধর্মনিরপেক্ষ সিভিল আইন (সবার জন্য) এবং শরীয়াহ আইন (কেবল মুসলিমদের পারিবারিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে)। চুরির শাস্তি বা ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে কুরআনিক দণ্ডবিধি (হুদুদ) এখানে কার্যকর নেই।

দেশটিতে মসজিদ, হালাল সার্টিফিকেশন, ইসলামিক ব্যাংকিং এবং হিজাবের প্রচলন দৃশ্যত চমৎকার। কিন্তু পশ্চিমা ভোগবাদী সংস্কৃতি ও বিশ্বায়নের প্রভাবে তরুণ মুসলিম প্রজন্মের মধ্যে কুরআনিক নৈতিকতার অভাব স্পষ্ট। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে অবাধ ফ্রী মিক্সিং সংস্কৃতি, হারাম সম্পর্ক, এবং পশ্চিমা জীবনযাত্রার অন্ধ অনুকরণ নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি করছে, যা কুরআনের ‘হায়া’ (শালীনতা) ও তাকওয়ার শিক্ষার পরিপন্থী। মালয়েশিয়ার পর্যটন খাত ও মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে পশ্চিমা পর্যটকদের অবাধ যাতায়াত রয়েছে। ফলে বড় শহরগুলোতে ক্যাসিনো (যেমন- জেন্টিং হাইল্যান্ডস), নাইটক্লাব ও মদের সহজলভ্যতা রয়েছে। যদিও মুসলিমদের জন্য এগুলো আইনিভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু সংস্কৃতির এই সংমিশ্রণ মুসলিম সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে প্রতিনিয়ত শিথিল করছে।

এটি প্রমাণ করে যে, কুরআনিক শিক্ষাকে আংশিক নয়, বরং পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ না করলে সমাজের নৈতিক ক্ষতি এড়ানো সম্ভব নয়।

পাকিস্তান: পাকিস্তান হলো বিশ্বের একমাত্র দেশ, যা ১৯৪৭ সালে সম্পূর্ণ একটি ইসলামিক আদর্শের ভিত্তি অর্থাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" জ্ঞানগানের ওপর ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে পাকিস্তান তার ইতিহাসের অন্যতম নিকৃষ্টতম বহুমুখী (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক) সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যে আদর্শের ভিত্তিতে দেশটির জন্ম হয়েছিল, সেই কুরআনিক ও ইসলামিক মূলবোধের চরম অনুপস্থিতিই আজকের এই পতনের মূল কারণ।

পাকিস্তানের সংবিধানে দেশটিকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' বলা হয়েছে এবং এখানে শক্তিশালী 'ইসলামিক আদর্শিক কাউন্সিল' রয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কুরআনিক শিক্ষার প্রতিফলন এখানে নামমাত্র। কুরআনের মূল শিক্ষা হলো শান্তি, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক মর্যাদা। কিন্তু পাকিস্তানে ধর্মকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও ভোটের মেরুকরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর ফলে সমাজে চরম উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ধর্ম অবমাননা আইনের অপব্যবহার করে নিরীহ মানুষকে পিটিয়ে মারার মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে, যা কুরআনের 'ন্যায়বিচার' ও 'মানবাধিকার' শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

রাষ্ট্র পরিচালনায় ও সমাজ জীবনে কুরআনের নৈতিক বিধানের অনুপস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় লেবাস থাকলেও সততা, আমানতদারী এবং ওয়াদা রক্ষার মতো মৌলিক কুরআনিক গুণাবলীর তীব্র অভাব দেখা যায়। দুর্নীতি, জালিয়াতি এবং নীতিহীনতা সমাজের রক্তে রক্তে প্রবেশ করেছে।

কুরআনিক সমাজ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো একটি বৈষম্যহীন, নিরাপদ এবং ইনসাফভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা। কিন্তু পাকিস্তানের সামাজিক চিত্র এর বিপরীত। পাকিস্তানে 'ফিডাল সিস্টেম' বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এখনও প্রবল। দেশের গুটিকয়েক বড় রাজনৈতিক পরিবার, বড় ব্যবসায়ী এবং সামরিক এলিটরা সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ মৌলিক অধিকার (শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য) থেকে বঞ্চিত। কুরআনের মূল দর্শন (সম্পদ যেন কেবল ধনীদেব মাঝে আবর্তিত না হয়) এখানে সম্পূর্ণ লঙ্ঘিত। শক্তিশালী ও ধনীদেব জন্য এক আইন এবং গরিবদের জন্য আরেক আইন—এই দ্বিমুখী বিচার ব্যবস্থার কারণে সাধারণ মানুষ আজ চরম 'মাজলুম'।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের ভাষণে এবং কুরআনে বারবার যে জাতিগত ও সামাজিক সমতার কথা বলেছেন, পাকিস্তানের ‘ভিআইপি কালচার’ তার বুকে কুঠারাঘাত করেছে। পাকিস্তানের রাজনীতি ইসলামের ‘শুরা’ বা পরামর্শভিত্তিক এবং জনকল্যাণমূলক শাসনের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তার ৫ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। পর্দার আড়ালে সামরিক এস্টাবলিশমেন্টের (Military Establishment) একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনীতিবিদদের সীমাহীন ক্ষমতার লোভ দেশকে রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করে রেখেছে। কুরআনে নেতা বা শাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ‘আমানতদারী’ ও ‘যোগ্যতা’কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো মূলত পরিবারতান্ত্রিক এবং নেতাদের বিরুদ্ধে বিলিয়ন ডলারের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগ প্রমাণিত। এই নৈতিক স্থলন পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

কুরআন ও হাদিসে সুদকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধ’ ঘোষণা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তান একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হয়েও এই ‘যুদ্ধ’-এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। পাকিস্তানের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং আইএমএফ (IMF)-এর ঋণের ওপর নির্ভরশীল। দেশের বাজেটের সিংহভাগ চলে যায় অতীতের ঋণের সুদ পরিশোধ করতে। সুদী অর্থব্যবস্থা এবং ভুল অর্থনৈতিক নীতির কারণে দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড ছুঁয়েছে। আটা, ডাল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। কুরআনে যেখানে দারিদ্র্য বিমোচন ও যাকাত-ভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে, সেখানে পাকিস্তান আজ দেউলিয়া হওয়ার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক শক্তির কাছে হাত পাততে বাধ্য হচ্ছে।

পাকিস্তানের বর্তমান চিত্রটি এটিই প্রমাণ করে যে, একটি রাষ্ট্র বা সমাজ কেবল মুখে ইসলামের স্লোগান দিয়ে বা কাগজে-কলমে নিজেকে ‘ইসলামিক রাষ্ট্র’ দাবি করে কখনো সফল হতে পারে না, যদি না তার অভ্যন্তরীণ নীতিতে কুরআনের প্রকৃত স্পিরিট বা মূল চেতনা কার্যকর থাকে। ক্ষমতার লোভ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, সুদী অর্থনীতি এবং সামাজিক অবিচার—যা কুরআন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে—সেগুলোকে জিইয়ে রাখার কারণে পাকিস্তান আজ বিশ্বের বুকে একটি ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। এটি কুরআনিক নৈতিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়ার সবচেয়ে বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষতি।

বাংলাদেশ: জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম প্রধান দেশ। এখানকার মানুষের মনস্তত্ত্বে ধর্মীয় আবেগ অত্যন্ত গভীর। তবে বাহ্যিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, সামষ্টিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরআনের প্রকৃত নৈতিকতা, সততা এবং ইনসাফের প্রয়োগ দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। ফলে সমাজে এক ধরনের তীব্র নৈতিক ও সামাজিক ক্ষত দৃশ্যমান।

বাংলাদেশের সমাজে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান (যেমন: ওয়াজ মাহফিল, জুমার নামাজে উপচে পড়া ভিড়, রোজা, হজ) ব্যাপকভাবে উদযাপিত হয়। কিন্তু কুরআনের মূল লক্ষ্য যে মানুষের চরিত্র সংশোধন করা, ব্যবহারিক জীবনে তার প্রতিফলন খুব কম।

দেশে সাধারণ শিক্ষা (সেকুলার) এবং মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে এক ধরনের আদর্শিক দূরত্ব রয়েছে। সাধারণ শিক্ষায় কুরআনের নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা সীমিত হওয়ায় নতুন প্রজন্মের একটি বড় অংশ পশ্চিমা ভোগবাদ ও সাইবার সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অল্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" কিন্তু বাংলাদেশের সমাজে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করার পরও ঘুষ, দুর্নীতি, খাদ্যে ভেজাল, সুদ এবং ওজনে কম দেওয়ার মতো অপরাধগুলো ব্যাপকভাবে ঘটছে। ধর্মীয় লেবাসের আড়ালে এই চারিত্রিক দ্বিমুখিতা কুরআনিক শিক্ষার মূল স্পিরিট থেকে বিচ্যুতির অন্যতম বড় সামাজিক প্রমাণ।

কুরআনিক সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি হলো পরিবার এবং পারস্পরিক সামাজিক দায়িত্ববোধ। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে পশ্চিমা অপসংস্কৃতি এবং আধুনিকায়নের অন্ধ অনুকরণে সামাজিক মূল্যবোধে ধস নেমেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে বিবাহবিচ্ছেদের হার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে, যা পারিবারিক স্থায়িত্বের কুরআনিক দর্শনের পরিপন্থী। এছাড়া মাদকাসক্তি (বিশেষ করে তরুণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে), কিশোর গ্যাং-এর উত্থান এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অল্লীলতা ও 'ভিউ'-কেন্দ্রিক সস্তা সংস্কৃতি সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। কুরআনে নারীকে যে অসীম মর্যাদা ও নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে, সমাজে তাকওয়া (আল্লাহভীতি)-র অভাবের কারণে তা লঙ্ঘিত হচ্ছে। নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ এবং পারিবারিক সহিংসতার ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষের মন থেকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতার কুরআনিক চেতনা উঠে গেলে সমাজ কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কুরআনের নির্দেশিত ঐক্য, পারস্পরিক সম্মান এবং জনকল্যাণমূলক শাসনের আদর্শ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে।

কুরআনের অন্যতম প্রধান শিক্ষা হলো—মুসলিমরা পরস্পর ভাই ভাই এবং সমাজে শান্তি ও ফিতনামুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে চরম কাদা-ছোড়াছুড়ি, প্রতিহিংসা এবং পরমতসহিষ্ণুতার অভাব স্পষ্ট। রাজনৈতিক স্বার্থে সমাজকে বিভক্ত করে রাখা হয়েছে, যা কুরআনিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যের ধারণাকে ধ্বংস করছে। রাজনীতি আজ জনগণের সেবার চেয়ে ক্ষমতা ও অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। কুরআনে যেখানে আমানতদারী ও যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে।

কুরআনিক অর্থনীতির মূল নীতি হলো ইনসাফ এবং সম্পদ যেন কেবল ধনীদের হাতে কুক্ষিগত না হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও এর বণ্টন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী।

দেশের ব্যাংকিং ও সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে সুদভিত্তিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এমনকি গ্রামীণ পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ এবং সুদের ব্যবসা সাধারণ মানুষকে আরও বেশি নিঃস্ব করে তুলছে। কুরআন যেখানে সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে, সেখানে সুদের এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সমাজের প্রান্তিক মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করছে। দেশে একদিকে যেমন বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও অর্থ পাচারের মহোৎসব চলছে, অন্যদিকে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উর্ধ্বগতি এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে জীবনধারণে হিমশিম খাচ্ছে। পদ্ধতিগত দুর্নীতি, ব্যাংক লুটপাট এবং সিভিকিট ব্যবসার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পকেট কাটার এই সংস্কৃতি কুরআনের 'ইনসাফ' ও 'হারাম বর্জন'-এর শিক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

বাংলাদেশের এই সামগ্রিক চিত্রটি প্রমাণ করে যে, কেবল ধর্মীয় অনুভূতি বা বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার উপস্থিতি একটি সমাজকে নৈতিক পতন থেকে রক্ষা করতে পারে না, যদি না কুরআনের সামগ্রিক জীবনবিধানকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রয়োগ করা হয়। মুখে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা রেখেও যখন অর্থনীতিতে সুদ, সমাজে নৈতিক শিথিলতা, এবং রাজনীতিতে ইনসাফের অভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তখন বাহ্যিক উন্নয়ন হলেও সমাজ ভেতর থেকে পচে যায়। বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক সংকট এটিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় যে, কুরআনিক শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ থেকে দূরে থাকার খেসারত একটি জাতিকে কীভাবে দিতে হয়।

অমুসলিম ও বিদেশী শক্তির দ্বারা নিপীড়িত মুসলিম জনপদ—

কুরআনের অন্যতম প্রধান শিক্ষা হলো—মাজলুমের পাশে দাঁড়ানো এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে বিশ্বের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে অমুসলিম শাসক ও শক্তির দ্বারা মুসলিমরা ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে:

ফিলিস্তিন: ইসরায়েলি জায়নবাদী বাহিনীর দ্বারা ফিলিস্তিনি মুসলিমরা কয়েক দশক ধরে নিজেদের মাতৃভূমিতেই বন্দি ও নিপীড়িত। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গাজায় যে নৃশংস গণহত্যা ও অবরোধ চলছে, তা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয়। অথচ মুসলিম বিশ্ব এখানে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ, যা কুরআনিক ভ্রাতৃত্ববোধের চরম অভাব প্রকাশ করে।

পূর্ব তুর্কিস্তান (শিনজিয়াং, চীন): উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীনা কমিউনিস্ট সরকারের সুপরিকল্পিত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দমনপীড়ন চলছে। লাখ লাখ উইঘুর মুসলিমকে ডিটেনশন ক্যাম্প (কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প) বন্দি করে তাদের দাড়ি রাখা, রোজা রাখা, কুরআন পড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং জোরপূর্বক তাদের মুসলিম পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে।

কাশ্মীর (ভারত): কাশ্মীরের মুসলিম জনগণ দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কঠোর নজরদারি ও দমনপীড়নের মধ্যে বাস করছে। ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর তাদের স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং উপত্যকাটিকে এক প্রকার অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

মিয়ানমার (রোহিঙ্গা মুসলিম): মিয়ানমারের সামরিক জাভা ও উগ্র বৌদ্ধদের দ্বারা পরিচালিত জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। নিজ দেশে তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং ভয়াবহ গণহত্যা চালানো হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের এই বহুমাত্রিক চিত্রটি পর্যালোচনা করলে একটি নির্মম সত্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়—মুসলিম উম্মাহর বর্তমান রাজনৈতিক পরাধীনতা, অর্থনৈতিক দাসত্ব এবং সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ তাদের ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নয়, বরং তা হলো আল-কুরআনের সামগ্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনদর্শন থেকে তাদের আদর্শিক বিচ্যুতি।

এই পর্যালোচনায় আমরা দেখেছি যে, কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার ক্ষতি কেবল একমুখী নয়, বরং তা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন গঠনে ভিন্ন ভিন্ন সংকটের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সুতরাং, মুসলিম বিশ্বের এই সামগ্রিক সংকটটি প্রমাণ করে যে, কুরআনকে কেবল একটি আনুষ্ঠানিক বা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বুক সেক্ষে সাজিয়ে রেখে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে তার বাস্তব প্রয়োগকে নির্বাসিত করার খেসারত আজ পুরো উম্মাহকে দিতে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ করা ‘ইনসাফ’ ও ‘তাকওয়া’-র আদর্শ বর্জন করে যখনই কোনো মুসলিম সমাজ মানব রচিত ত্রুটিপূর্ণ মতবাদ কিংবা অন্ধ ভোগবাদকে আপন করে নিয়েছে, তখনই বাহ্যিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও তার আত্মিক ও সামাজিক পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। মুসলিম উম্মাহর এই নৈতিক ও সামাজিক ক্ষত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো—কুরআনের শাস্ত ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার আলোয় সমাজ ও চরিত্রের আমূল সংস্কার সাধন করা।

অধ্যায়-৬ কুরআনমুখী হওয়ার উপায় ও সমাধান

কুরআন কারীম এক জীবন্ত মুজিয়া। যেখানে দুনিয়ার কোন শক্তি কাজ করে না, সেখানেও কুরআন অলৌকিক শক্তিতে পথ তৈরি করে দেয়। বেশিরভাগ সাহাবী ঈমান এনেছিলেন কুরআনের প্রভাবে। চরম বৈরী পরিবেশেও কুরআন আপন কাজ করে যেতে সক্ষম।

কুরআন কারীম সাধারণ কোন কিতাব নয়। কুরআন কারীম কোন ইতিহাস গ্রন্থও নয়। কুরআন সাধারণ জ্ঞানের বইও নয়। হ্যাঁ, কুরআন কারীমে তথ্য বা সাধারণ জ্ঞান আছে, তবে কুরআনের মূল লক্ষ্য তথ্য বিতরণ নয়। কুরআনের মূল উদ্দেশ্য মানুষের হেদায়াত। কুরআন আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক পোক্ত করার জন্য কাজ করে। কুরআন মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর করার প্রতি গুরুত্ব দেয়। তিলাওয়াতের সময় সজাগ থাকতে হবে জীবনকে সুন্দর করার মূলনীতি সামনে পড়ে কিনা।

কুরআন পাঠে যত বেশি হেদায়াত ও হেকমত খুঁজবো, কুরআনের সাথে আমাদের তত বেশি হৃদয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কুরআন পড়তে হবে পিপাসা নিয়ে। হেদায়েতের পিপাসা হেকমত বা প্রজ্ঞার পিপাসা। যখন সরাসরি কুরআন থেকে জীবনঘনিষ্ঠ কোন মূলনীতি সংগ্রহ করা হবে, সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে, সে আলোকে নিজেকে পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। কুরআন পাঠ করবে নিজেকে বদলানোর উদ্দেশ্যে নিজেকে শুধরানোর তাগিদে। তাহলে কুরআন পাঠ হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত আর ফলপ্রসূ। কুরআন মুখী হওয়ার উদ্দেশ্য এই না যে শুধু সওয়াব হাসিল করবে। কুরআন শুধু সওয়াব হাসিলের জন্য নাযিল হয়নি। কুরআন না বুঝে পড়লেও সওয়াব হবে। কুরআন পড়া উচিত বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, বিশেষ ভঙ্গিতে, বিশেষ পদ্ধতিতে। ধরা যাক, ঘুটঘুটে অন্ধকারে উত্তাল সাগরে জাহাজে করে কোথাও যাচ্ছে। ক্যাম্পাস নষ্ট; দিক নির্ণয় করা যাচ্ছে না। তখন করণীয় কি? আকাশের তারা দেখে দিক ঠিক করা। ঠিক এমনই জীবনের কঠিন মুহূর্ত যখন সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে পরবে, তখন যেন কুরআন হয়ে ওঠে সর্বশেষ অবলম্বন।

কুরআন মুখী হওয়ার অর্থ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনের অনুসরণ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। কুরআন যেসব বিষয় নিষিদ্ধ করেছে তা থেকে দূরে থাকা। কুরআনের স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করা।

৬.১ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন

রাসূল ﷺ একটি দোয়া করতেন— ‘হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে রক্ষা চাই সেই শিক্ষা থেকে যে শিক্ষাতে মানুষের কোন কল্যাণ নেই।’

দীর্ঘ কয়েক দশক থেকে আমাদের ঘাড়ের চেপে বসে আছে সেই শিক্ষা, সেই শিক্ষা ব্যবস্থা যা জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধন করতে পারেনি। পারেনি একমুখী আদর্শের দক্ষ মানুষ তৈরি করতে। এই শিক্ষা, এই শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষানীতি অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। পরিবর্তনের চেষ্টা ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই শুরু হয়েছে।

কুরআন মাজিদে শিক্ষাকে বলা হয়েছে ‘রুশদ’ অর্থাৎ আলো বা সঠিক পথ। পবিত্র কুরআনে সূরা কাহাফে আমরা দেখতে পাই, মুসা আঃ একজন জ্ঞানী শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান শিখতে গিয়ে তাকে বলেছিলেন—

هَلْ أَتَّبَعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

‘আমি কি আপনাকে এই শর্তে অনুসরণ করব যে, আপনাকে যে সঠিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তা আমাকে শিক্ষা দেবেন?’ সূরা কাহাফ (১৮:৬৬)

মূলত শিক্ষা হচ্ছে আলো এবং সঠিক পথের নির্দেশনা। অথচ আমাদের সমাজে এখন শিক্ষা হচ্ছে কালো, অর্থাৎ এই শিক্ষা আমাদের যুব সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে, নিয়ে যাচ্ছে কুপথে, ভ্রান্ত পথে। এ শিক্ষা আমাদের তরুণদের ছেড়ে দিচ্ছে উজ্জ্বল জীবনের পরিবর্তে অন্ধকার জীবনের দিকে।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে শিক্ষাকে বলা হয়েছে ‘তারবিয়া’। এর অর্থ- to bring up, to raise up, to increase, to grow up, to lead, to breed, to teach, to instruct. কিন্তু শিক্ষার এই যে অর্থগুলো কি আমাদের সমাজে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিফলিত হয়? না, তা হয় না। বরং অধঃপতনের দিকে আমাদের শিক্ষা আমাদের তরুণ সমাজকে ছেড়ে দিচ্ছে। কারণ শুধু দক্ষতা অর্জনের নামই শিক্ষা নয়। বরং শিক্ষা হলো দক্ষতা অর্জন এবং দক্ষতাকে নৈতিকতার মানদণ্ডে প্রশিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে, শিক্ষা হবে তা’দীব। আদব থেকে এসেছে তা’দীব। তা’দীব মানে- to well breed, to be mannered, receive a fine education, to make cultured, to be polite, to be courteous, to be civil, to be urban, to follow someone's moral example. এই হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আর কুরআনের তো বলা হয়েছে, শিক্ষা হবে সেই জিনিস, তা থেকে আলো পাওয়া যাবে। মূলত, কুরআন থেকে বোঝা যায়, একটি দক্ষ জাতি গঠন করতে হলে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন, যা থেকে ছাত্ররা তিনটি পর্যায়ে জ্ঞান লাভ করবে। কুরআনের শিক্ষার পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে-তাদরিস। তাদরিস মানে পাঠদান বা পাঠ গ্রহণ করা। এটি শিক্ষা দান বা শিক্ষা গ্রহণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই তাদরিসের উদ্দেশ্য হতে হবে ‘ফাহম’ বা সঠিক বুঝ ও ধারণা অর্জন করা। আল্লাহ বলেন—

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ

‘অতঃপর আমি এ বিষয়ের ফয়সালা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।’ সূরা আশ্বিয়া (২১:৭৯)

ফাহম মানে- বুঝ। ফাহম থেকে তাফহিম শব্দটি এসেছে। তাফহিম মানে বুঝিয়ে দেয়া। পড়া ছাত্রদেরকে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়া কি সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়? বুঝ ঠিকমতো আমাদের ছাত্র সমাজ পাচ্ছে না। তৃতীয়ত ছাত্রদের শুধু বুঝিয়ে দিলেই চলবে না। সেই সাথে ‘তাফাক্কুহ’ অর্থাৎ সঠিক ধারণা ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি clear conception অর্জনের ব্যবস্থাও করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۚ

‘অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।’ সূরা তাওবাহ (৯:১২২)

কুরআন বলেছে, একদল লোককে বেরিয়ে পড়তে হবে ‘তাফাক্কুহ ফীদদীন’ অর্জনের জন্যে। দ্বীনের সঠিক নলেজ, দ্বীনের সঠিক ধারণা, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, clear conception অর্জন করার জন্যে। দ্বীন মানে- জীবন দর্শন, জীবন ব্যবস্থা, জীবনযাপন পদ্ধতি। এখানে ‘আদ-দ্বীন’ মানে ইসলাম।

জাতির অভিভাবকদের ভেবে দেখা দরকার, আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের তরুণ যুবকরা তাদের জীবন দর্শন, জীবন ব্যবস্থা ও জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক বুঝ, স্বচ্ছ ধারণা ও নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করছে কি? বস্তুত সেই conception অর্জন থেকে বহুদূরে আছি আমরা।

শিক্ষকগণ হলেন সমাজ গড়ার কারিগর। তারাই অভিভাবক এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রেরণা। সমাজের দেয়ালের উত্তম ইটগুলোকে তারাই প্রস্তুত করেন। ফলে সমাজের দেয়াল হয়ে উঠে দুর্ভেদ্য। কোন অসৎ চরিত্র এবং কাজের অনুপ্রবেশ ঘটে না তাতে এবং সেই জাতি হয়ে ওঠে সর্বোত্তম জাতি।

শুধু জ্ঞান এবং চিন্তার সবক শেখানোর মাঝেই শিক্ষকগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবনের প্রতিটি পদে পদেই রয়েছে তাদের প্রয়োজনীয়তা। তারাই সর্বদা ধর্ম পালন এবং সুচরিত্র গঠনের নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকেন। তারাই উত্তম চিন্তা চেতনার প্রচার প্রসারের সিঁড়ি হয়ে থাকেন। সমাজ এবং জাতি যে বিপদ ও দুর্যোগের সম্মুখীন হয়, তারাই দেখিয়ে দেন তা থেকে উত্তরণের পন্থা। উম্মাহ দিকে ধেয়ে আসা কষ্ট এবং চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলায় তারা রাখেন অসামান্য অবদান। ছাত্রদের মাঝে তারা ছড়িয়ে দেন আত্মত্যাগ এবং উচ্চ মানসিকতার চেতনা। যেন তারা ফিরিয়ে আনতে পারে উম্মাহর হারিয়ে ফেলা সেই মর্যাদার মুকুট। যেন তারা অপহৃত হয়ে যাওয়া ভূখণ্ডগুলো পুনরুদ্ধার করে তাতে সঞ্চর করতে পারেন নবপ্রাণ।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

‘অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ...।’ সূরা আহযাব (৩৩:২১)

নবী কারিম ﷺ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম শিক্ষক যিনি মানুষকে সৎ পথের দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন। প্রতিটি মুসলমানের জন্য তিনি আদর্শ এবং মডেল। তাই প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত তাঁর কথা ও কাজে আদর্শ পরিণত হওয়া।

বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলে থাকেন— ‘হাজার লোকের ক্ষেত্রে একজন লোকের আমল তথা কাজ, একজন লোকের ক্ষেত্রে হাজার লোকের কথার চেয়ে উত্তম।’ ফাইজুল কাদির, আল মুনাবি, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:১০৪

আদর্শে পরিণত হওয়ার জন্য শিক্ষকগণের করণীয় হচ্ছে—

১. আল্লাহ তা’আলাকে ভয় করা এবং ইসলামিক শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরা।
২. যথাসময়ে নামাজ আদায় করা।
৩. অঙ্গীকার এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।
৪. সহকর্মী এবং ছাত্রদের সাথে উত্তম আচরণ করা।

৫. প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়া এবং পরিপূর্ণ সভ্য হওয়া।
 ৬. জবানকে সংযত রাখা এবং প্রত্যেক কলুষিত কাজ থেকে বিরত থাকা।
 ৭. উত্তমভাবে চলাফেরা করা।
 ৮. অধিক পরিমাণে পাঠ এবং অধ্যয়ন করা
 ৯. আমলের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং যথাযথভাবে সম্পন্ন করা।
 ১০. ছাত্রদের সাথে বন্ধুত্ব পূর্ণ আচরন করা এবং বিপদ আপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো।
- এভাবেই শিক্ষক-উস্তাদ শিক্ষা -শিখন- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছাত্রের উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে। যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায়।

আদর্শ শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হলো—

১. জাতির জনগণের মৌলিক বিশ্বাস ও নৈতিকতা।
২. জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য।
৩. জাতীয় চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা।
৪. যুগের চাহিদা।
৫. জাতির জনসম্পদ ও বস্তুসম্পদ
৬. জাতীয় সম্পদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
৭. উন্নয়নের ক্ষেত্রে।
৮. উন্নয়নের টার্গেট।

আদর্শ পাঠ্যসূচি প্রণয়নে করণীয়—

১. বিশেষজ্ঞ টাস্কফোর্স ও জাতীয় কমিটি গঠন
২. চাহিদা নিরূপণ ও লক্ষ্য নির্ধারণ।
৩. দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়।
৪. পাঠ্যপুস্তক লিখন ও সহজীকরণ।
৫. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্তকরণ।
৬. পরীক্ষামূলক প্রয়োগ।
৭. শিক্ষক প্রশিক্ষণকরণ।

কুরআনিক শিক্ষাদানে করণীয়—

১. ছাত্রদের ইসলামের মৌলিক আকিদা শিক্ষা দেয়া।
২. নিষ্ঠা ও ইখলাস শিক্ষা দেয়া।

৩. ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়া।
 ৪. কুরআন শিক্ষা দেয়া।
 ৫. তারতীব ও তারতিলের সহিত কুরআন পাঠের নির্দেশ দেয়া।
 ৬. অর্থবুঝে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দেয়া।
 ৭. তাফসির ও হাদিসের কিতাব অধ্যয়নের নির্দেশ দেয়া।
 ৮. আল্লাহর স্মরণের নির্দেশ দেয়া।
 ৯. আল্লাহর কাছে চাওয়া, দোয়া করার শিক্ষা দেওয়া।
 ১০. আল্লাহর কাছে ভুল ত্রুটি ও অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া, তওবা করার নির্দেশ দেয়া।
 ১১. দ্বীনি মজলিসে জুড়ে থাকার আদেশ দেয়া।
 ১২. রাসূল ﷺ এর সুন্নাত মোতাবেক জীবন পরিচালনায় উৎসাহী করা।
 ১৩. অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া।
 ১৪. নজরের হেফাজত ও পর্দার আদেশ দেওয়া।
 ১৫. পরোপকার করা। অপরের কল্যাণে আত্মনিয়োগ ও আত্মত্যাগ করতে উৎসাহী করা।
 ১৬. আখিরাতের স্মরণ করতে নির্দেশ দেয়া।
- দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার আদর্শ সমন্বয়ের মূল চাবিকাঠি হলো—"জ্ঞান অর্জিত হবে আধুনিক যুগের সর্বোচ্চ মানে, কিন্তু তার ব্যবহার হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবতার কল্যাণে।" এই লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষা প্রশাসনকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে।

৬.২ পারিবারিকভাবে কুরআনের চর্চা বাড়ানো

পরিবারকে কুরআনমুখী করে তুলতে এবং পারিবারিক পর্যায়ে কুরআনের চর্চা বাড়াতে সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। একটি পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করতে মা-বাবা এবং বড়দের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

পারিবারিকভাবে কুরআনের চর্চা বাড়ানোর সহজ ও কার্যকর উপায়গুলো হলো:

১. পারিবারিক বৈঠক (হালাকা): প্রতিদিন বা সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময়ে পরিবারের সবাই একসাথে বসে কুরআনি মুজাকারা করা। কুরআনের মহত্ত্ব ও মুজিয়া নিয়ে কথা বলা। কুরআনের সাথে কাটানো সময়গুলোতে রয়েছে বরকত। কুরআন ব্যক্তি সংশোধন করে। পরিবারের সদস্যরা যখন কুরআন দ্বারা সংশোধিত হবে তখন পরিবারের মধ্যে প্রশান্তি বিরাজ করবে। কুরআন মানুষের মধ্যে হৃদয়তা সৃষ্টি করে। ফলে পরিবারের সদস্যদের একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। দৈনিক মুজাকারার ফলে কুরআন তাদাব্বুর করা সহজ হয়। অন্তত একটি আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা আলোচনা করা।

২. বড়দের রোল মডেল হওয়া: মা-বাবা নিজেরা নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা, যা দেখে সন্তানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুপ্রাণিত হবে। ছোটরা সব সময় বড়দের অনুসরণ করতে পছন্দ করে। যে পরিবারের বড়রা কুরআনের সাথে বেশি বেশি সফর করে সেই পরিবারের ছোটরা কুরআনের প্রতি দ্রুত আকৃষ্ট হয়। কুরআনের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। কুরআনের আদেশ নিষেধ মেনে চলে।

৩. যৌথ তিলাওয়াত: ঘরের সবাই মিলে দৈনিক অন্তত ১০ মিনিট একসাথে বসে কুরআন পড়ার অভ্যাস করা। পরিবারে একসাথে কুরআন তিলাওয়াত করা একটি অত্যন্ত সুন্দর ও বরকতময় আমল। এটি শুধু ইবাদত নয়, বরং পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে, সন্তানদের মধ্যে কুরআনের প্রতি ভালোবাসা জাগায় এবং ঘরে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। পরিবারের সবাই মিলে তিলাওয়াত করলে ঘরে প্রশান্তি ও রহমত নাজিল হয়।

ছোটরা বড়দের দেখে শিখে, আর বড়রা ছোটদের সংশোধন করতে পারে। একসাথে বসে তিলাওয়াত করলে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতা বাড়ে। নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নিলে অভ্যাস তৈরি হয়। ফলে ঘরে রহমতের ফেরেশ্তারা আসে। শয়তানের ওয়াসওসা থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়। সবাই মিলে যৌথ তিলাওয়াতের ফলে কুরআনের প্রতি অনিহা সৃষ্টি হয় না।

৪. ঘরে তিলাওয়াত বাজানো: সকালের দিকে বা অবসরে ঘরের ভেতর মৃদু আওয়াজে কোনো ক্বারীর সুন্দর সুরের তিলাওয়াত চালু রাখা। ঘরের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত বাজানো শুধু আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে না, বরং মানুষের মন, পরিবার ও পরিবেশে বহুমুখী উপকারিতা রেখে যায়। কুরআনের শব্দ ও আয়াত হৃদয়ে প্রশান্তি আনে, দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ কমায়। ঘরে কুরআন তিলাওয়াত হলে আল্লাহর রহমত নেমে আসে

এবং ফেরেশতারা উপস্থিত হন। তিলাওয়াত শয়তানকে দূরে রাখে, ফলে ঘরে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে। পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত কুরআন শুনলে তাদের মধ্যে নৈতিকতা, সততা ও ধৈর্য গড়ে ওঠে। ছোটরা কুরআনের শব্দ শুনে সহজে আয়াত মুখস্থ করতে পারে এবং ইসলামী পরিবেশে বেড়ে ওঠে। একসাথে কুরআন শোনা পরিবারের মধ্যে ভালোবাসা ও ঐক্য বাড়ায়।

অর্থাৎ, ঘরে কুরআন তিলাওয়াত বাজানো মানসিক শান্তি, আল্লাহর রহমত, শয়তান থেকে সুরক্ষা, নৈতিক শিক্ষা এবং পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে।

৫. কুরআনের গল্প শোনানো: ছোটদেরকে কুরআনে বর্ণিত নবী-রাসুল এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা গল্পের ছলে শোনানো। ছোটরা গল্পের মাধ্যমে আল্লাহর নবী-রাসুলদের জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারে। সততা, ধৈর্য, আল্লাহর প্রতি ভরসা—এসব গুণ গল্পে সহজে বোঝানো যায়। সবাই মিলে গল্প শোনার সময় আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি হয়। গল্প শেষে শিশুদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করলে তাদের বোঝার ক্ষমতা বাড়ে। যেমন:

১. হযরত ইউসুফ (আ.): ধৈর্য, সততা ও আল্লাহর প্রতি ভরসার শিক্ষা।
২. হযরত ইবরাহিম (আ.): তাওহীদ ও আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।
৩. হযরত মূসা (আ.): অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
৪. আযহাবে কাহফ: ঈমান রক্ষার জন্য তরুণদের সাহসী সিদ্ধান্ত।
৫. সোলাইমান আঃ : প্রজ্ঞা, বিচার- ফয়সালা করার দক্ষতা।
৬. রাসূল ﷺ এর পুরো জীবনটাই শিক্ষা।

৬. পুরস্কার ও প্রতিযোগিতা: শিশুদের ছোট ছোট সূরা বা আয়াত মুখস্থ করার জন্য উপহার বা প্রশংসার মাধ্যমে উৎসাহিত করা। যেমন- কে সবচেয়ে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতে পারে, নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াত মুখস্থ করার প্রতিযোগিতা, আয়াত পড়ে তার অর্থ ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করা, কুরআনের গল্প ও শিক্ষা নিয়ে ছোট কুইজ ইত্যাদি। এসব প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার পাওয়া লোভ বাচ্চাদের মনন ও মানসিকতায় কুরআনের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। পুরস্কার হতে পারে- বই, কলম, ইসলামিক স্টিকার বা তাসবিহ, প্রিয় খাবার বেছে নেওয়ার সুযোগ, খেলাধুলার সময় বাড়ানো অথবা পরিবারের সামনে প্রশংসা করা, বিশেষ দোয়া করা ইত্যাদি।

৭. সহজ অনুবাদের বই রাখা: ঘরে সহজ ভাষায় লেখা কুরআনের অনুবাদ ও ছোটদের উপযোগী ইসলামিক বই সংগ্রহে রাখা। আয়াতের মূল বক্তব্যকে সহজ বাংলা ভাষায়

অনুবাদ করা থাকলে ছোটদের জন্য বোঝা সহজ হয়। আয়াতের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ব্যাখ্যা দেওয়া থাকলে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা কম থাকে।

৮. অল্প দিয়ে শুরু করা: শুরুতেই বেশি না পড়ে, প্রতিদিন মাত্র ৩ থেকে ৫টি আয়াত অর্থসহ নিয়মিত পড়ার নিয়ম করা। যাতে কারো মধ্যে বিরক্তির ভাব চলে না আসে। যখন অভ্যাসে পরিনত হয়ে যাবে তখন আস্তে আস্তে আয়াতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। পরিবারের সবার পড়াশোনা করার যোগ্যতা সমান থাকে না। আবার কেউ কেউ বেশি পড়তে পছন্দ করে আবার কেউ অল্প করে। তাই সবার দিক খেয়াল রেখে তিলাওয়াত ও তাদাব্বুরের পরিমাণ বাড়ানো।

৯. আচরণে কুরআনের প্রতিফলন: কুরআন শুধু তিলাওয়াতের জন্য নেয়, বরং কুরআনিক শিক্ষা পারিবারিক জীবনে বাস্তবায়নও করতে হবে। কুরআন পিতা-মাতার প্রতি দয়া, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে। পিতা-মাতার খেদমত করার নির্দেশ দিয়েছে। আর পিতা-মাতাকে আদেশ করেছে সন্তানকে উত্তম ভাবে তারবিয়াত করতে। মায়া, মমতা, ভালোবাসা দিয়ে তাদের বড় করতে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে হবে—অর্থাৎ সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিকতায় গড়ে তোলা। আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন, যা পারিবারিক শান্তির ভিত্তি। স্বামী-স্ত্রীর যদি একে অপরের হক ঠিকভাবে আদায় না করে তাহলে পারিবারিক জীবন হয়ে যাবে দুর্বিষহ। রাগ কমানো, সত্য বলা ও সুন্দর করে কথা বলার মতো কুরআনিক নির্দেশগুলো পারিবারিক জীবনে চর্চা করতে হবে। কুরআনে আত্মীয়দের হক আদায়ের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তাই ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের আচরণে কুরআনিক শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারলেই পারিবারিক জীবন সুন্দর ও সফল হবে।

১০. একসাথে দোয়া করা: পরিবারকে দ্বীনের পথে ধরে রাখতে এবং কুরআনমুখী করতে সবাই মিলে একসাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। একসাথে দোয়া করলে আল্লাহর রহমত দ্রুত নেমে আসে, কারণ সম্মিলিতভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়। নবী ﷺ বলেছেন, ‘যখন একটি জামাত একসাথে দোয়া করে, তখন আল্লাহ তা কবুল করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেন।’ পরিবারের সবাই মিলে দোয়া করলে ঘরে ইসলামী পরিবেশ তৈরি হয় এবং সন্তানরা সহজে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করে। যেমন—সন্তানরা মা-বাবার জন্য দোয়া করতে পারে—

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَّانِي صَغِيرًا

‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।’ সূরা বনি ইসরাইল (১৭:২৪)

আবার মা-বাবাও সৎ ও নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করতে পারে—

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

‘হে আমার রব! আমাকে নেক সন্তান দান করো।’ সূরা আস-সাফাত (৩৭:১০০)

৬.৩ মিডিয়া ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার

কুরআনমুখী হওয়ার উপায়কে আজকের যুগে কার্যকর করতে হলে মিডিয়া ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার অপরিহার্য। আধুনিক প্রযুক্তি যেমন মানুষের মনোযোগ কেড়ে নেয়, তেমনি সঠিকভাবে ব্যবহার করলে তা কুরআন শিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।

মিডিয়া ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে নিজেকে এবং পরিবারকে কুরআনমুখী করা যায়, তা তুলে ধরা হলো—

১. সোশ্যাল মিডিয়ার ফিড নিয়ন্ত্রণ: ফেসবুক, ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামে নির্ভরযোগ্য ইসলামিক স্কলার, কারী এবং কুরআন অ্যাকাডেমির পেজগুলো ফলো করে রাখা। যাতে অবসর সময়ে ইসলামিক লেকচার, বা কুরআন তিলাওয়াত শুনা যায়। কুরআনিক কন্টেন্টে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করা, যাতে সোশ্যাল মিডিয়ার হোমপেজে আপনাআপনি কুরআনের বাণী ভেসে ওঠে। শেয়ার করার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকতে হবে দাওয়াহ। কারণ, লাইক, কমেন্ট পাওয়ার আশার বা লোক দেখানোর জন্য করলে তা গুনাহের কারণ হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের সময় নষ্ট না করে।

আর নারীর জন্য ন্যায় সঙ্গত নয় যে কোন পুরুষ মানুষের ইসলামিক লেকচার শোনার সময় স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকবে, যা নজরের হেফাজতে বিঘ্ন ঘটায়। এমন কোন আমল যেটা হয়তো অত গুরুত্ব দিয়ে করা হয় নি, সেটি কোন লাইক, কমেন্ট, শেয়ার পায়নি, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সে সম্পর্কে জানতেন; ওই আমলটিই আপনার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষার বিষয় হবে। ওসব অনর্থক লাইক, কমেন্ট, শেয়ারের আবর্জনা স্তূপের মধ্যে ওই একটি আমলই হবে একবিন্দু আলো। সর্বোপরি, খেয়াল রাখতে হবে সোশ্যাল মিডিয়ার অবাধ বিচারণ যেন গুনাহের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

২. স্মার্টফোন অ্যাপসের ব্যবহার: ফোনে আল-কুরআন (যেমন: Al Quran - Tafsir & By Word, বা Muslim Pro) অ্যাপ রাখা, যাতে সহজে অর্থ ও তাফসির পড়া যায়। অ্যাপের 'আয়াত অব দ্য ডে' বা দৈনিক রিমাইন্ডার অপশন চালু রাখা, যা প্রতিদিন অন্তত একটি আয়াত পড়ার কথা মনে করিয়ে দেবে। 'আয়াত অব দ্য ডে' রিমাইন্ডার অপশন চালু রাখলে স্ক্রিনে একেক দিন একেক আয়াত দেখা যাবে, যা তাৎক্ষণিক ভাবে পড়া ফেলা সম্ভব। এছাড়াও এসব অ্যাপসে অডিও অন রেখে তিলাওয়াত শুনা, তিলাওয়াত শুদ্ধ করার জন্য কোন নির্দিষ্ট কারীর তিলাওয়াত শুনা, তাজবিদের রুলস গুলো কালার করা থাকে যা পড়ার সময় কোন কারনে বাদ পড়ে যায় না। সহিহ ভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে সাহায্য করে।

৩. স্মার্ট টিভি ও গ্যাজেটের ব্যবহার: সকালবেলা বা অবসরে ঘরের স্মার্ট টিভি বা ব্লুটুথ স্পিকারে অর্থসহ সুন্দর সুরের তিলাওয়াত বাজিয়ে রাখা। যা পরিবারের সদস্যদের মন ফ্রেশ রাখে। মাঝে মাঝে পরিবারের সবাই মিলে ইউটিউবে কুরআনের অলৌকিকত্ব বা ঐতিহাসিক গল্পের কোনো শিক্ষণীয় ভিডিও বা ডকুমেন্টারি দেখা। যা মানুষের ইমান বাড়ায় এবং আল্লাহ তাআলার কুদরত নিয়ে চিন্তা করা যায়।

৪. যাতায়াত ও অলস সময়ের ব্যবহার: জ্যামে বা যাতায়াতের সময় হেডফোনে কুরআনের চমৎকার কোনো তাফসির সিরিজ বা পডকাস্ট শোনা। অনলাইনে অনেক ভালো ভালো সিরিজ বা পডকাস্ট পাওয়া যায়। কিছু আছে রাসূল ﷺ এর সীরাহ, তাফসির, কুরআনের বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা – যেগুলো শুনলে কুরআনের বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়। আবার, 'Quran Memorization' টাইপের অ্যাপ ব্যবহার করে ছোট ছোট আয়াত অডিও শুনে শুনে মুখস্থ করার চেষ্টা করা। অনেকে ব্যস্ততার কারণে চাইলেও মুখস্থ করতে পারে না, তারা শুনে শুনে মুখস্থ করার চেষ্টা করা উচিত। অথবা নিজের ভয়েস রেকর্ড করেও শুনে শুনে প্রতিদিন কয়েকটি করে আয়াত মুখস্থ করা যায়।

৫. অনলাইন লার্নিং ও কোর্স: বর্তমানে সকল কাজ অনলাইন নির্ভর হয়ে গিয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে ব্যস্ত মানুষকে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের সম্মানিত আলেম ও দ্বীনের দায়ী সমাজ বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। তাদের নিরলস শ্রম ও প্রচেষ্টায় বর্তমান স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি পড়ুয়া ভাই-বোনেরা একাডেমিক পড়াশোনা পাশাপাশি এই সব অনলাইন কোর্স গুলো করতে পারছে। আরেকটি ভালো দিক হলো এসব প্রতিষ্ঠানে বয়সের কোন সীমারেখা দেওয়া

থাকে না। যার ফলে যেকোনো বয়সের মানুষ দ্বীনি ইলম সহজেই অর্জন করতে পারছে। তাই ঘরে বসেই সহীহ তিলাওয়াত, তাজবিদ বা আরবি ভাষা শেখার জন্য কোনো অনলাইন কোর্সে (লাইভ বা রেকর্ডেড) যুক্ত হওয়া। যারা ব্যস্ততার কারণে লাইভ ক্লাস করতে পারবে না তাদের জন্য থাকে রেকর্ডেড সুবিধা। এছাড়া বিভিন্ন ইসলামিক অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে কুরআনিক কুইজে অংশ নিয়ে নিজের জ্ঞানকে ঝালিয়ে নেওয়া।

৬. প্রযুক্তির নেতিবাচক দিক বর্জন: প্রযুক্তির অতিরিক্ত আসক্তি কমাতে স্ক্রিন টাইম ট্র্যাকার ব্যবহার করা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার সময় কমিয়ে সেই সময়টা কুরআনকে দেওয়া। প্রতিদিন অন্তত আধা বা এক ঘণ্টার জন্য ফোন পুরোপুরি দূরে সরিয়ে রেখে সরাসরি (হার্ডকপি) কুরআন পড়ার অভ্যাস করা। কুরআনের মুসহাব ধরে পড়লে যতোটা তারতীব ও তারতীলের সহিত তিলাওয়াত করা যায়, ফোন বা ল্যাপটপে তা হয় না।

৬.৪ কুরআনের ব্যাপারে ভুল উপলব্ধি থেকে বেচে থাকা

কুরআনের আয়াত বা বার্তার ভুল ব্যাখ্যা, ভুল উপলব্ধি এবং বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা অতিব জরুরি। কুরআন পড়তে গিয়ে অনেক সময় কোন কোন আয়াতের মর্মার্থ আমাদের বুঝে আসেনা। শুধু বুঝিনা, তা নয়। বরং মাঝেমধ্যে এমন ভালোভাবে বুঝি যে, আল্লাহ তাআলা ও তার নবী আঃ দের ব্যাপারে কু-ধারণা তৈরি হয়।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই এরকম ধারণার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ তার উচিত ছিল এসব আয়াতের মর্মার্থ আলিমদের থেকে জেনে নেয়া। নিজের অন্তর কে মন্দ ধারণা থেকে মুক্ত রাখা, আকিদা-বিশ্বাস ঠিক রাখা।

কুরআনের ইরশাদ হয়েছে, সমকামী লোকদের উদ্দেশ্যে লূত আঃ বলেছেন –

هُؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۖ

‘ওরা আমার মেয়ে, যদি তোমরা করতেই চাও (তবে বিবাহের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে কর)।’ সূরা হিজর (১৫:৭১)

অনেকে ধারণা করে, লূত আঃ তাদেরকে সমকামিতার বদলে নারীদের সাথে ব্যভিচার করতে বলেছেন, কারণ এটাতে গুনাহ কম।

আশ্চর্য হওয়ার বিষয়! কারণ, কিছু মানুষ বছরের পর বছর কুরআনের এইসব আয়াত নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ে ভুগেন, অথচ এটার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করে না।

এমনটা কখনোই সমীচীন নয়। কারণ অন্তরের চিকিৎসা তো দেহের রোগের চিকিৎসার চেয়েও জরুরি। দেহের কোন রোগ তো চিকিৎসা না করে বছরের পর বছর পুষে রাখা হয় না। তাহলে কুরআনের ভুল উপলব্ধি যে রোগ অন্তরে তৈরি হয়েছে তার চিকিৎসা তো আরো বেশি জরুরী। বহু লোক তো রোগ নিজের মধ্যে রেখেই কবরে চলে যায়। এই আয়াতের মর্মার্থ কী তবে?

এখানে ‘আমার মেয়ে’ দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে:

এক. তাঁর উম্মতের মেয়ে। কারণ প্রত্যেক নবি তাঁর উম্মতের কাছে পিতা সমতুল্য। যেমন রাসূল ﷺ বলেন—

‘আমি তোমাদের পিতা তুল্য, তোমাদের আমি শিক্ষা দিয়ে থাকি।’ সুনানু আবী দাউদ -৮, হাসান

এখানে লূত আঃ তাঁর উম্মতের সমকামী পুরুষদের বলেছেন বিয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক যৌনাচার করতে।

দুই. তাঁর নিজের ঔরসজাত মেয়ে।

এখানেও বিয়ের কথাই বলা হয়েছে ; যিনার অনুমতি নয়। অন্য আরেক আয়াতে এটাই ইঙ্গিত করে।

قَالَ يَقَوْمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ.

‘লূত বললেন, “হে আমার জাতি, এই-যে আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র”।’ সূরা হুদ (১১ : ৭৮)

যিনা ব্যাভিচার তো পবিত্র নয়। সমকামিতার বদলে যিনা করা মানে এক অশ্লীলতা ছেড়ে আরেক অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া। লূত আঃ এখানে স্পষ্টতই বিয়ের নির্দেশ দিচ্ছেন। কোনো নবি গুনাহের লিপ্ত হওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন, এটা চিন্তা করাও পাপ।

কুরআনের কোন আয়াত স্বয়ং ইসলামেরই কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে যেতে পারেনা। যেমন নবীগণ যে নিষ্পাপ, তা ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ আকিদা। কুরআনে এর বিপরীত কিছু থাকবে না। যদি কোন আয়াত পড়ে সেরকম মনেও হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদেরই বুঝতে ভুল হয়েছে।

এভাবে কোন আয়াত পড়ে মনে খটকা তৈরি হলেই আমাদের উচিত বিষয়টি নিজের মধ্যে পুষে না রেখে দ্রুত সঠিক ব্যাখ্যা জেনে নেওয়া।

৬.৫ শতহীন আনুগত্য

পূর্ণ বিনয় সহকারে শতহীন দাসত্ব আর একনিষ্ঠ কে বলা হয় ইবাদত। খেয়ালী পূর্ণ ঐচ্ছিক আনুগত্যের নাম ইবাদত নয়।

মাক্কেমধ্যে চিন্তা ফিকির না করে কাজ করাই উত্তম। কথাটা অদ্ভুত লাগলো, তাই না? আল্লাহর কালাম নিয়ে তো চিন্তা-ফিকির করতেই হবে। ভাবতেই হবে এখানে আল্লাহ তায়াল্লা আমাকে কি করতে বলেছেন, কিভাবে করতে বলেছেন ইত্যাদি।

কিন্তু এরপর? আল্লাহর এই হুকুম পালন করব, না কি করবো না—এ নিয়েও কি আবার চিন্তা ভাবনা করা লাগবে?

না ভাই; এখন আর কোন ভাবা ভাবির সুযোগ নেই। এখন তো আপনি জেনে গেছেন যে, এটা আল্লাহর বিধান। এখন মাথায় যে চিন্তা-ফিকির আর হিসাব-নিকাশের পোকা ঘুরছে সেটা হচ্ছে আপনার নফসে আন্মারা আর জনাব শয়তানের যৌথ কুমন্ত্রণা। উনারা দুজন যৌথ উদ্যোগে আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরাতে চাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۚ

‘শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে।’

সূরা বাকারাহ (২: ২৬৮)

মানে কি এই আয়াতের?

মানে হলো আপনি যাকাত বা দান সাদাকাহ করতে চাইলে শয়তান ভয় দেখায়, ‘আরে ব্যাটা! তুই তো ফকির হয়ে যাবি।’ উল্টো অশ্লীল কাজ করতে কুমন্ত্রণা দেয় আপনাকে। আর এই অবস্থায় ‘অশ্লীল কাজ’ কোনটা? যাকাত আদায় না করা।

এখন আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

‘আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।’

অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় দান করলে তিনিও আপনাকে দান করবেন। বরকত দিয়ে দেবেন সম্পদের।

এজন্য যাকাত আদায়, অভাবী ভাই-বোনদেরকে সাহায্য করা, মাকে প্রতি মাসে তার চলার খরচ দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে খরচ করার সময় যখন আপনার মাথায় এটা সেটা চিন্তা ফিকির ঘুরপাক খাবে নিশ্চিত বুঝে নিবেন শয়তানকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে।

‘আরে মিয়া! এত টাকা খরচ করতেছো, বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ আছে না?’

‘এম্মে দুই হাতে টাকা বিলাইলে তো আপনার ভিক্ষার ঝুলি লইতে বেশিদিন লাগবেনা!’

‘হে হে! দাও দাও! কয়দিন পর ভিটাবাড়ি সব বেচা লাগবে!’

এরকম আরো কত কিছু ভাবনায় আসবে। মগজে ভিড়তেই দেয়া যাবে না এসব চিন্তা ফিকির। কেননা এগুলো সব ইবলিশের ওয়াসওয়াসা। এসব পরিস্থিতিতে অন্তরকে বুঝান,

وَاللّٰهُ يَعْذُرُكُمْ مِّنْهُ وَفَضْلًا

‘আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন।’

যাকাত ও দান সাদাকার বিষয়টি উদাহরণ মাত্র। আলোচ্য আয়াতটি ধ্রুবক। এখানে অন্য যেকোনো দ্বীনি কর্তব্য বসালে একই সিদ্ধান্ত মিলবে।

★ কোন দুর্বল মাজলুম ভাইয়ের আপনার একান্ত সাহায্য প্রয়োজন। প্রয়োজন আপনার একটু সাহসী ভূমিকা। এবার আয়াত মেলান—

‘শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে।

আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন।’

এখানে শয়তান আপনাকে জালিমের অত্যাচারের ভয় দেখাচ্ছে এবং কাপুরুষতার আদেশ দিচ্ছে। আর আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন জালিমদের হাত থেকে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার।

★ পর্দা করতে চান কিন্তু লোকজনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভয় করছেন। এখানেও আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেখুন—

‘শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে।

আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন।’

শয়তান আপনাকে আশেপাশের লোকজনের নিন্দার ভয় দেখাচ্ছে এবং বেপর্দা হওয়ার আদেশ করছে। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, এদের পরিবর্তে তিনি নিজে আপনার বন্ধু হবেন। এমনকি অনেকে অনুসরণ করবে আপনার এই কাজ। সকল ক্ষেত্রে সেই অবস্থানে গ্রহণ করবেন, যেটা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। ফলাফলে কি হবে না হবে, সে বিষয়ে চিন্তা করা আপনার দায়িত্ব নয়।

তো এই হলো আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বিপরীতে শয়তানের আশ্বাস।

শয়তানের প্রতিশ্রুতির স্বরূপ হলো—

يَعِدُّهُمْ وَيُمَيِّتُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

‘সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর শয়তান তাদেরকে কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়।’ সূরা আন-নিসা (৪:১২০)

পক্ষান্তরে আল্লাহর ওয়াদার বাস্তবতা এমন —

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

‘আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।’ সূরা রুম (৩০:৬)

এবার সিদ্ধান্ত আপনার; কার প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখবেন।

পরিশেষে বলা যায়, আল-কুরআনের শর্তহীন আনুগত্য কেবল কোনো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথ। আল্লাহর বিধানের সামনে নিজের অহংকার ও খেয়ালখুশিকে সমর্পণ করার মাধ্যমেই একজন মানুষ প্রকৃত মুমিন হয়ে ওঠে। সাময়িক দুনিয়াবী লাভ-ক্ষতির উর্ধ্বে উঠে ঐশী আলোর এই অনন্য উৎসকে নিঃশর্তভাবে জীবনে ধারণ করার মাঝেই নিহিত রয়েছে ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত শান্তি, সাম্য এবং সার্থকতা।

অধ্যায়-৭ উপসংহার ও সুপারিশ

মানবজাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হলো পবিত্র কুরআন। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে বস্তুগত ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছেও মানবসমাজ এক গভীর নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, সমকালীন এই বহুমুখী সংকটের মূল কারণ হলো ঐশী নির্দেশনা তথা কুরআন বিমুখতা। কুরআন ও নৈতিকতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং কুরআনিক শিক্ষার মূল স্তম্ভ— তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে প্রভাব মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও কলবকে পরিশুদ্ধ করার মূল চালিকাশক্তি। তাওহীদুল উলুহিয়াহ ও রুবুবিয়াতে বিশ্বাস মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের অধীনে নিয়ে আসে। অন্যদিকে, রিসালাতের আদর্শ এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী জীবনের জবাবদিহিতা ও পুলসিরাতে ভয়াবহতার চেতনা মানুষকে অন্যায় থেকে দূরে রাখে।

কিন্তু বর্তমানে তাকওয়াহীনতা ও আখিরাতে বিমুখতার ফলে সমাজে সততা ও আমানতদারিতার অভাব, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার এবং আধুনিক ভোগবাদের মারাত্মক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে আত্মিক অস্থিরতা, ডিপ্রেসন এবং অশ্লীলতা মহামারী আকার ধারণ করেছে। এই নৈতিক পতন কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক থাকেনি, বরং তা পারিবারিক কাঠামোতে ধ্বস নামিয়েছে, বিবাহবিচ্ছেদ জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি করেছে এবং প্রতিবেশীর হক নষ্ট করে সামাজিক দূরত্ব তৈরি করেছে, যার ফলশ্রুতিতে সমাজে বিচারহীনতা ও দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

একই সাথে আধুনিক বিশ্বের পুঁজিবাদী সুদি ব্যবস্থার শোষণ এবং যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির অনুপস্থিতির কারণে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি হয়েছে। প্রগতি ও নারী স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা ভাবধারার 'নারীবাদ' নারীর সুরক্ষাকবচ ও হিজাবের প্রাচীর ভেঙে তাকে এক নতুন শোষণের শিকারে পরিণত করেছে এবং পারিবারিক ভাঙন ত্বরান্বিত করেছে। এই অন্ধকার গহ্বর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো শতহীন আনুগত্যের মাধ্যমে পুনরায় কুরআনমুখী হওয়া। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ইসলামি নৈতিকতা, তাকওয়া এবং কুরআনিক শিক্ষার মূলনীতিসমূহকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

পরিবার হলো সমাজ গঠনের আদি একক, তাই প্রতিটি পরিবারে মা-বাবার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সন্তানদের শৈশব থেকেই আল্লাহর ভয় এবং পরকালীন জবাবদিহিতার পাঠ দিতে হবে এবং নিয়মিত কুরআন-হাদিসের পারিবারিক তালিম বা তারবিয়্যাতের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে পুঁজিবাদী সুদি অর্থব্যবস্থাকে বর্জন করে শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকিংকে উৎসাহিত করতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক 'যাকাত তহবিল' গঠন করে তা অভাবী ও ঋণগ্রস্তদের পুনর্বাসনে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় বণ্টন করতে হবে।

আধুনিক ভোগবাদী শোষণের হাত থেকে নারীদের রক্ষা করতে কুরআনিক আইন অনুযায়ী তাদের সম্পত্তি, মোহরানা ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ইসলামি হিজাব ও শালীনতার গুরুত্ব বোঝাতে হবে। ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত চরিত্রবিধ্বংসী অশ্লীল বিষয়বস্তুর প্রচার আইনগতভাবে বন্ধ করে তথ্যপ্রযুক্তিকে ইসলামি দাওয়াহ ও নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে হবে। সমাজ থেকে আত্মকেন্দ্রিকতা ও অপরাধপ্রবণতা দূর করতে প্রতিবেশীর হুক আদায়ের ব্যাপারে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের কুরআনিক সুন্নাহকে সমাজে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। সর্বোপরি, সমাজের প্রতিটি স্তরে অন্যায় ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে 'আমর বিল মা'রুফ' বা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলে অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেন বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর হয়।

৭.১ সারসংক্ষেপ

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বের মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং নৈতিক পতন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং তা মহান আল্লাহর জিকির ও ওহীর বিধান ত্যাগ করার অবধারিত পরিণতি। সমাজকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে তাত্ত্বিক আলোচনার বাইরে গিয়ে কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের বসন্ত ও অন্তরের নূর বানিয়ে দিন এবং এই ক্ষুদ্র গবেষণা কর্মটিকে পরকালীন মুক্তির উসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।